WWW.BANGLABOOK.COM

প্রশ্নকর্তা শুধু বলে, আচ্ছা যা। একবার জিজ্ঞেসও করে না, ফাঁস নেবার ইচ্ছেটা কেন হল।

তাঁর আত্মহননের ইচ্ছা তুচ্ছ সব কারণে হয়। তাঁকে খেতে দেয়া হয়েছে। ভাত-তরকারি সবই দেয়া হয়েছে। কিন্তু লবণ দিতে ভুলে গেছে। তিনি লবণ চেয়েছেন। যে ভাত দিচ্ছে সে হয়ত শুনেনি। তিনি শান্তমুখে খাওয়া শেষ করলেন। পানি খেলেন। পান মুখে দিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকে গেলেন দড়ির খোঁজে। এই হল ব্যাপার।

সবই আমার শোনা কথা। আমরা বছরে একবার ছুটির সময় নানার বাড়ি বেড়াতে যেতাম। থাকতাম দশ-পনেরো দিন। এই সময়ের মধ্যে নারিকেল-মামার দড়ি নিয়ে ছোটাছুটির দৃশ্য দেখিনি। তাঁকে আমার মনে হয়েছে অতি ভাল একজন মানুষ। আমাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় তাঁর কোন সীমা ছিল না। একটা গল্পই তিনি সম্ভবত জানতেন। সেই গল্পই আমাদের শোনাবার জন্যে তাঁর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। কাঁইক্যা মাছের গল্প।

এক দীঘিতে একই কাঁইক্যা মাছ বাস করত। সেই দীঘির পাড়ে ছিল একটা চাইলতা গাছ। একদিন কাঁইক্যা মাছ চাইলতা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। হঠাৎ একটা চাইলতা তার গায়ে পড়ল। সে দারুণ বিরক্ত হয়ে বলল,

চাইলতারে চাইলতা তুই যে আমায় মাইলি?

উত্তরে চাইলতা বলল,

কাঁইক্যারে কাঁইক্যা, তুই যে আমার কাছে আইলি?

এই হল গল্প। কেনই-বা এটা একটা গল্প, এর মানে কি আমি কিছুই জানি না। কিন্তু এই গল্প বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে নারিকেল-মামার চোখে পানি এসে যেত। আমি তাঁর কাছে এই গল্প বারবার শুনতে চাইতাম তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখার জন্যে।

সেবার রোজার ছুটিতে নানার বাড়ি গিয়েছি। তখন রোজা হত গরমের সময়। প্রচণ্ড গরম। পুকুরে দাপাদাপি করে অনেকক্ষণ কাটাই। আমরা কেউই সাঁতার জানি না। নারিকেল-মামাকে পুকুর পাড়ে বসিয়ে রাখা হয় যাতে তিনি আমাদের দিকে লক্ষ রাখেন। তিনি চোখ-কান খোলা রেখে মূর্তির মত বসে থাকেন। একদিন এইভাবে বসে আছেন। আমরা মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাচ্ছি, হঠাৎ শুনি বড়দের কোলাহল — ফাঁস নিছে। ফাঁস নিছে।

পানি ছেড়ে উঠে এলাম। নারিকেল-মামা নাকি ফাঁস নিয়েছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। নানার বাড়ির পেছনের জঙ্গলে জামগাছের ডালে দড়ি হাতে নারিকেল-মামা বসে আছেন। দড়ির একপ্রান্ত জামগাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। অন্য প্রান্ত তিনি তাঁর

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

গলায় বেঁধেছেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ার মত ডালের দু'দিকে পা দিয়ে বেশ আয়েশ করে বসে আছেন।

আমরা ছোটরা খুব মজা পাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লোক দড়িতে ঝুলে মরবে, সেই দৃশ্য দেখতে পাব — এটা সে সময় আমাদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। বড়রা অবশ্যি ব্যাপারটাকে মোটেও পাত্তা দিল না। আমার নানাজান বললেন, আজ গরমটা অতিরিক্ত পড়েছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে। তিনি নারিকেল-মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, নাম্ হারামজাদা! নারিকেল-মামা বিনীত গলায় বললেন, 'জ্বে না মামুজী। ফাঁস নিমু।'

'তোরে মাইরা আজ হাড্ডি গুঁড়া করব। খেলা পাইছস? দুইদিন পরে পরে ফাঁস নেওয়া। ফাঁস অত সস্তা। রোজা রাখছস?'

'রাখছি।'

'রোজা রাইখ্যা যে ফাঁস নেওন যায় না এইটা জানস?'

'জ্বে না।'

'নাইম্যা আয়। ফাঁস নিতে চাস ইফতারের পরে নিবি। অসুবিধা কি? দড়িও তোর কাছে আছে। জাম গাছও আছে। নাম কইলাম। রোজা রাইখ্যা ফাঁস নিতে যায়! কত বড় সাহস! নাম।'

নারিকেল-মামা সুড়সুড় করে নেমে এলেন। মোটেও দেরি করলেন না। আমাদের মন কি যে খারাপ হল। মজার একটা দৃশ্য নানাজানের কারণে দেখা হল না। নানাজানের ওপর রাগে গা জ্বলতে লাগল। মনে ক্ষীণ আশা, ইফতারের পর যদি নারিকেল-মামা আবার ফাঁস নিতে যান।

ইফতারের পরও কিছু হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর নারিকেল-মামা হৃষ্টচিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোত্থেকে যেন একটা লাটিম জোগাড় করলেন। শহর থেকে আসা বাচ্চাদের খুশি করার জন্যে উঠোনে লাটিম খেলার ব্যবস্থা হল। আমি এক ফাঁকে বলেই ফেললাম, মামা, ফাঁস নিবেন না? তিনি উদাস গলায় বললেন, যাউক, রমজান মাসটা যাউক। এই মাসে ফাঁস নেয়া ঠিক না।

'রমজানের পরে তো আমরা থাকব না। চলে যাব। আমরা দেখতে পারব না।'

নারিকেল-মামা উদাস গলায় বললেন, এইসব দেখা ভাল না গো ভাইগ্ন্যা ব্যাটা। জিহ্বা বাইর হইয়া যায়। চউখ বাইর হইয়া যায়। বড়ই ভয়ংকর।

'আপনি দেখেছেন?'

'ভাইগ্ন্যা ব্যাটা কি কয়? আমি দেখব না! একটা ফাঁসের মরা নিজের হাতে দড়ি কাইট্যা নামাইছি। নামাইয়া শইল্যে হাত দিয়ে দেখি তখনও শইল গরম। তখনও জান ভেতরে রইছে। পুরাপুরি কবজ হয় নাই।'

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

'হয়নি কেন?'

'মেয়েছেলে ছিল। ঠিকমত ফাঁস নিতে পারে নাই। শাড়ি পেঁচাইয়া কি ফাঁস হয়? নিয়ম আছে না? সবকিছুর নিয়ম আছে। লম্বা একটা দড়ি নিবা। যত লম্বা হয় তত ভাল। দড়ির এক মাথা বানবা গাছের ডালে, আরেক মাথা নিজের গলায়। ফাঁস গিট্টু বইল্যা একটা গিট্টু আছে। এইটা দিবা। তারপরে আল্লাহর কাছে তওবা কইরা সব গোনার জন্যে মাফ নিবা। তারপর চউখ বন্ধ কইরা দিবা লাফ।'

'দড়ি যদি বেশি লম্বা হয় তাহলে তো লাফ দিলে মাটিতে এসে পড়বেন।'

'মাপমত দড়ি নিবা। তোমার পা যদি মাটি থাইক্যা এক ইঞ্চি উপরেও থাকে তাইলে হবে। দড়ি লম্বা হইলে নানান দিক দিয়া লাভ। দশের উপকার।'

দড়ি লম্বা হলে দশের উপকার কেন তাও নারিকেল-মামা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

'ফাঁসের দড়ি নানা কাজে লাগে বুঝলা ভাইগ্ন্যা ব্যাটা? এই দড়ি সোনার দড়ির চেয়েও দামী। এক টুকরা কাইট্যা যদি কোমরে বাইন্ধ্যা থয় তা হইলে বাত-ব্যাধির আরাম হয়। ঘরের দরজার সামনে এক টুকরা বাইন্ধ্যা থুইলে ঘরে চোর-ডাকাত ঢোকে না। এই দড়ি সন্তান প্রসবের সময় খুব কাজে লাগে। ধর, সন্তান প্রসব হইতেছে না — দড়ি আইন্যা পেটে ছুঁয়াইবা, সাথে সাথে সন্তান খালাস।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। ফাঁসির দড়ি মহামূল্যবান। অনেক ছোট ছোট পুলাপান আছে বিছানায় পেসাব কইরা দেয়। ফাঁসের দড়ি এক টুকরা ঘুনসির সাথে বাইন্ধ্যা দিলে আর বিছানায় পেসাব করব না। এই জন্যেই বলতেছি যত লম্বা হয় ফাঁসের দড়ি ততই ভাল। দশজনের উপকার। ফাঁস নিলে পাপ হয়। আবার ফাঁসের দড়ি দশজনের কাজে লাগে বইল্যা পাপ কাটা যায়। দড়ি যত লম্বা হইব পাপ তত বেশি কাটা যাইব। এইটাই হইল ঘটনা। মৃত্যুর পরে পরেই বেহেশতে দাখিল।

নারিকেল-মামার মৃত্যু হয় পরিণত বয়সে। ফাঁস নিয়ে না — বিছানায় শুয়ে। শেষ জীবনে পক্ষাঘাত হয়েছিল, নড়তে-চড়তে পারতেন না। চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে হত। মৃত্যুর আগে গভীর বিষাদের সঙ্গে বলেছিলেন — আল্লাহপাক আমার কোন আশা পূরণ করে নাই। ঘর দেয় নাই, সংসার দেয় নাই। কিছুই দেয় নাই। ফাঁস নিয়া মরণের ইচ্ছা ছিল এটাও হইল না। বড়ই আফসোস!

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

পরীক্ষা

একটা নির্দিষ্ট বয়সের বাবা-মা'রা মনে করতে শুরু করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা বোধহয় তাঁদের আর ভালবাসে না, বোধহয় তারা এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজেদের সংসার নিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তবে এই ব্যাপারে তাঁরা পুরোপুরি নিশ্চিতও হতে পারেন না। এক ধরনের সন্দেহ থাকে — হয়ত এখনো ভালবাসে। হয়ত বাবা মা'র প্রতি ভালবাসা নিঃশেষ হয়নি। এই সংশয়-জড়ানো দোদুল্যমান সময়ে বাবা-মা'রা নানান ধরনের ছোটখটি পরীক্ষা করতে থাকেন। ছেলেমেয়েদের ভালবাসা এখনো আছে কি-না তা নিয়ে পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও তাঁরা সংশয়ে ভুগেন। কোন ফলাফলই তাঁদের ১০০ ভাগ নিশ্চিত করতে পারে না।

আমার মা বর্তমানে এ জাতীয় মানসিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর ছ'টি ছেলেমেয়েকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। তাদের আচার-আচরণ থেকে ধরার চেষ্টা করছেন — ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর প্রতি ভালবাসা কতটুকু অবশিষ্ট আছে।

ভালবাসা মাপার মত কোন যন্ত্র আমাদের হাতে আসেনি। সমস্যাটা এইখানেই। ভালবাসা ধরতে হয় আচার-আচরণে — হাব-ভাবে। একজনের আচার-আচরণের সঙ্গে অন্যের আচার-আচরণের কিছুমাত্র মিল নেই বলে ভালবাসা'র প্রমাণ সংগ্রহ করাও এক সমস্যা। কাজেই আমার মা নানান ধরনের পরীক্ষা শুরু করলেন।

যেমন অনেকদিন পার করে আমার বাসায় এলেন। রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, শরীর ভাল না। উদ্দেশ্য — দেখা, তার ছেলে এই খবরে কতটা বিচলিত হয়। সে কি সাধাসাধি করে খেতে বসায়, না নির্বিকার থাকে। না-কি অতি ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডেকে আনে।

এই জাতীয় পরীক্ষায় আমি কখনো পাস করতে পারি না। আমার অন্য ভাই-বোনরাও পারে না। সবাই ভাব করে, বয়স হয়েছে, এখন শরীর তো খারাপ করবেই। শুধু আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই মায়ের অতিরিক্ত ভক্ত বলে ব্যস্ত হয়ে উঠে। জোর করে তাঁকে টেবিলে এনে খাওয়ায় — খাওয়াতে না পারলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

আনতে যায়। তার একজন পরিচিত প্র্যাকটিসহীন ডাক্তার আছেন। যাঁকে যে কোন সময় কল দিলে চলে আসেন। আমাদের মধ্যে মা'র ভালবাসা পরীক্ষায় সেই শুধু অনার্সসহ পাস। আমরা ফেল।

আমার বন্ধু মোজাম্মেল হোসেন সাহেবের মাও এই আমার মা'র মতই ছেলেমেয়েদের ভালবাসা আছে কি নেই পরীক্ষা শুরু করেছেন। তিনি শারীরিকভাবে বেশ সুস্থ। তবু একদিন দেখা যায়, কোন এক ছেলে বা মেয়ের কাছে গিয়ে অকারণে অনেকক্ষণ কাশলেন, হাঁচলেন। নিজেই নিজের কপালের উত্তাপ দেখলেন। তাঁর উদ্দেশ্য — ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর আচার-আচরণ দেখে জিজ্ঞেস করে কি-না — মা তোমার কি শরীর খারাপ? কি আশ্চর্য! তোমার শরীর খারাপ আমাদের বলবে না? দেখি কাপড় পর, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

তিনি বিরস গলায় বললেন, বাদ দে, ডাক্তারের কাছে কি নিবি। বয়স হয়েছে, গলায় রোগ-ব্যাধি তো হবেই।

'কথা বলে সময় নষ্ট করো না তো মা। কাপড় পর। ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।'

তিনি আনন্দিত চিত্তে কাপড় পরতে চলে যান। ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভালবাসে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

আমার বন্ধু এবং বন্ধুর বোনরা তাঁদের মা'র এই ব্যাপারটা জানেন। তারা এখন নিয়ম করে সবাই তাঁদের মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। একেক জনের একেক ডাক্তার। মা মহাখুশি। তাঁর সময় কাটে ডাক্তারের কাছে ঘুরে ঘুরে।

আমার মা'র প্রসঙ্গে ফিরে আসি — তিনি আমাদের নিয়ে অনেক ছোটখাট পরীক্ষা করলেন। বেশির ভাগ পরীক্ষার ফল হল — অনিশ্চিত। নিশ্চিত পরীক্ষা দরকার। কাজেই তিনি সেই পরীক্ষার জন্যে তৈরি হলেন। এক সন্ধ্যায় শুনলাম, তিনি বেশ কিছুদিন দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকবেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, এটা শুনেই তাঁর ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠবে — আরে না, অসম্ভব। আপনি দেশে যাবেন কি? না না, দেশে যেতে হবে না।

কিন্তু তা বলা হল না। মা দেশে চলে গেলেন। আর ফেরার নাম নেই। সাত দিনের বেশি যে মহিলা তাঁর ছেলেমেয়েদের না দেখে থাকতে পারেন না তিনি এক মাস কাটিয়ে দিলেন। ভাবলেন, ছেলেমেয়েরা খোঁজখবর করবে। আসতে না পারলেও চিঠি দেবে। না, কেউ চিঠিও দিল না। তিনি নিজেই লজ্জার মাথা খেয়ে সবার কাছে চিঠি লিখলেন — অতি সংক্ষিপ্ত পত্র।

'আমি ভাল আছি। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। নামাজ পড়বে। সর্বদা আল্লাহ্‌পাককে স্মরণ করবে। ইতি তোমার মা।"

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

আমরা কেউ সেই চিঠির জবাব দিলাম না। আসলে মা'র অভিমানের গুরুত্বই কেউ ধরতে পারলাম না। এই বয়সে তিনি যে ছেলেমেয়েদের এক জটিল পরীক্ষায় ফেলবেন সেটা কে অনুমান করবে? আমরা ভাবলাম, নিজের বাড়িতে থাকতে মা'র নিশ্চয় খুব ভাল লাগছে। ভাল না লাগলে তো চলেই আসবেন।

দু' মাস কেটে গেল। আমার ছোট মেয়ে একদিন বলল, আজ রাতে দাদীকে স্বপ্নে দেখেছি। দাদীকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তখন আমার মনে হল, আরে তাই তো — অনেক দিন মা'কে দেখি না। বাসটা খালি। আচ্ছা চল, মা'কে ধরে নিয়ে আসি। মাইক্রোবাস নিয়ে চলে যাই ময়মনসিংহ। সবাইকে খবর দেয়া যাক। ক্ষীণ একটা আপত্তি উঠল — এই গভীর রাতে বাস নিয়ে এতদূর যাওয়াটা কি ঠিক হবে? সেই আপত্তি বাচ্চাদের উৎসাহের কাছে টিকল না। এক্ষুনি যেতে হবে। এক্ষুনি। রাত এগারোটায় বাস ভর্তি করে আমরা সব ভাই-বোন, তাদের বাচ্চা-কাচ্চারা রওনা হলাম।

ময়মনসিংহ পৌঁছলাম রাত দু'টায়। মা তাঁর এক ভাইয়ের বাসায় আছেন। সেই বাসার ঠিকানা জানা নেই। ঠিকানা খুঁজে বাসা বের করতে করতে রাত তিনটা বেজে গেল। রাত তিনটায় কড়া নেড়ে মা'র ঘুম ভাঙানো হল।

বাচ্চা-কাচ্চারা চেঁচিয়ে বলল, দাদীমা, তোমাকে নিতে এসেছি।

মা'র চোখ ভিজে উঠল। তিনি কপট বিরক্তিতে বললেন, এদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি। কোথাও গিয়ে যে শান্তিমত দু'-একটা দিন থাকব সেই উপায় নেই। রাত তিনটার সময় উপস্থিত হয়েছে। ছেলেমেয়েগুলিরও কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই — রাত তিনটায় দুধের বাচ্চা নিয়ে সব রওনা হয়েছে। রাস্তায় যদি বিপদ-আপদ কিছু ঘটতো? এদের বুদ্ধি-শুদ্ধি কি কোন কালেই হবে না?

মা তার বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমেয়েদের বকা ঝকা করতে করতে নিজের ব্যাগ গুছাতে শুরু করেছেন। ছেলেমেয়েদের ভালবাসা টের পাবার যে কঠিন পরীক্ষা মা শুরু করেছিলেন আমরা সবাই সেই পরীক্ষায় ফেল করতে করতে ভাগ্যক্রমে লেটার মার্ক পেয়ে পাস করে গেলাম।

ঢাকায় ফেরার পথে মনে হল, এই দিন খুব দূরে নয় যখন ভালবাসার পরীক্ষা নেবার কেউ থাকবে না। পরীক্ষায় পাস-ফেল নিয়ে আমাদের চিন্তিত হতে হবে না। আমরা সবাই নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার অফুরন্ত সুযোগ পাব।

বাসের পেছনের সীটে দাদীর পাশে কে বসবে তা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। মা'র গলা শুনতে পাচ্ছি — তোরা কি যে যন্ত্রণা করিস! এই জন্যেই মাঝে-মধ্যে তোদের ছেড়ে চলে যাই।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

আমার বন্ধু সফিক

ইদানীং পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে বড় ধরনের ধাক্কা খাই — কি চেহারা একেকজনের — দাঁত পড়ে গেছে, গালের চামড়া গেছে কুঁচকে, মাথায় অল্প কিছু ফিনফিনে চুল। কলপ দিয়ে সেই চুলের বয়স কমানো হয়েছে কিন্তু সাদা সাদা গোড়া উঁকি দিচ্ছে।

ওদের দিকে তাকালে মনে হয় — হায় হায়, আমার এত বয়স হয়ে গেছে? এখন কি তাহলে যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করব? মীরপুর গোরস্তানে জমি দেখতে যাব?

আয়নায় যখন নিজেকে দেখি তখন এতটা বয়স মনে হয় না। হাস্যকর হলেও সত্যি, নিজেকে যুবক-যুবকই লাগে। ঐ তো কি সুন্দর চোখ। চোখের নিচে কালি পড়েছে। এটা এমন কিছু না, রাত জাগি, কালি তো পড়বেই। কয়েক রাত ঠিকমত ঘুমুতে পারলে চোখের কালি দূর হয়ে যাবে। মুখের চামড়ার বলিরেখা? ও কিছু না। অনেক যুবক ছেলেদের মুখেও এমন দাগ দেখা যায়। মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে? এটা কোন ব্যাপারই না। চুল পাকা বয়সের লক্ষণ নয়। মানুষের বয়স শরীরে না, মনে।

আমাদের মত বয়েসীদের হঠাৎ রঙিন কাপড়ের দিকে ঝুঁকে যেতে দেখা যায়। চক্রাবক্রা হাওয়াই শার্ট পরে এরা তেজী তরুণের মত হাঁটতে চেষ্টা করে — জরাকে অগ্রাহ্য করার হাস্যকর চেষ্টা। চোখে-মুখে এমন একটা ভাব যেন এইমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পড়া চুকিয়ে রাস্তায় নেমেছি। বান্ধবীকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোন কাফেতে চা খেতে যাব কিংবা বাদাম ভাঙতে ভাঙতে রাস্তায় হাঁটব।

এরকম একদিনের কথা। নাপিতের দোকান থেকে চুল কেটে বের হয়েছি। চুল কাটার ফলে গোড়ার শাদা চুল বের হয়ে এসেছে। বিশ্রী দেখাচ্ছে। মেজাজ খারাপ করে এক পান সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি। সিগারেট কিনে বাসায়

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

ফিরব। হঠাৎ দেখি যুবক একটা ছেলে কদবেল কিনছে। সে বসেছে উবু হয়ে। বেল শুঁকে শুঁকে দেখছে। তার পেছনেই শাড়ি পরা এক তরুণী। তরুণী লজ্জা পাচ্ছে বলে মনে হল। ছেলেটিকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আবার চিনতেও পারছি না। সে দু'টা কদবেল কিনে উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, আরে তুই!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এ হচ্ছে আমাদের সফিক। ঢাকা কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। তারপর যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে।

সফিক বলল, তুই এত বিশ্রী করে চুল কেটেছিস। তোকে দেখাচ্ছে পকেটমারের মত।

আমার হতভম্ব ভাব তখনো কাটে নি। আমি অবাক হয়ে সফিককে দেখছি। ব্যাটার বয়স বাড়ে নি। জরা তাকে স্পর্শ করে নি। তাকে ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র বললে কেউ অবিশ্বাস করবে না।

সফিক বলল, দোস্ত, এ হচ্ছে আমার বড় মেয়ে। ইন্টারমিডিয়েট সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। এর নাম শাপলা। শাপলা মা, চাচাকে পা ছুঁয়ে সালাম কর্।

আমি বললাম, বাজারের মধ্যে কিসের সালাম?

'বাজার-টাজার বুঝি না। সালাম করতে হবে।'

মেয়ে একগাদা লোকের মধ্যেই নিচু হয়ে সালাম করল। সফিক আমার হাত ধরে বলল, চল আমার সাথে।

'কোথায়?'

'আমার বাসায়, আবার কোথায়?'

'আরে না। চুল কেটেছি — গোসল করব।'

'কোন কথা না। শাপলা মা — তুই শক্ত করে চাচার একটা হাত ধর্। আমি আরেক হাত ধরছি। দু'জনে মিলে টেনে নিয়ে যাব।'

আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হল। ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে আর্থিক অবস্থা নড়বড়ে। বসার ঘরে বার ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি। ইদানীং টিভির মাপ থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা আঁচ করার একটা সুবিধা হয়েছে। সফিক আমাকে টানতে টানতে একেবারে রান্নাঘরে নিয়ে উপস্থিত — দাঁড়া বৌকে অবাক করে দিই — সে তোর নাটক দেখে গ্যালন গ্যালন চোখের পানি ফেলে। চোখের পানির মূল মালিক ধরে নিয়ে এসেছি।

রান্নাঘরে আমাকে দেখে সফিকের স্ত্রী অত্যন্ত বিব্রত হল এবং দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। স্বামীর পাগলামির সঙ্গে বেচারী বোধহয় এত দিনেও মানিয়ে নিতে পারে নি।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

'ছিঃ ছিঃ, কি অবস্থা রান্নাঘরের। এর মধ্যে আপনাকে নিয়ে এসেছে। ওর কোনদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না। ও কি ছাত্র-জীবনেও এরকম ছিল?'

আমি জবাব দিতে পারলাম না। ছাত্র-জীবনে সফিক কেমন ছিল আমার মনে নেই। ডিম-সিদ্ধ তার খুব পছন্দের খাবার ছিল — এইটুকু মনে আছে। সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে আস্ত মুখে ঢুকিয়ে দিত। এই সময় তার আরামে চোখ বন্ধ হয়ে যেত।

আমি লক্ষ্য করলাম, সফিকের বয়স না বাড়লেও তার স্ত্রীর ঠিকই বেড়েছে। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয়, জীবন-যুদ্ধে তিনি পরাজিত। ক্লান্তি ও হতাশা তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। অসুখ-বিসুখেও মনে হয় ভুগছেন। যতক্ষণ কথা বললেন, ক্রমাগত কাশতে থাকলেন —। কাশতে কাশতে বললেন, আপনি এসেছেন আমি খুশি হয়েছি। আপনাকে যে যত্ন-টত্ন করব সেই সামর্থ নেই। সংসারের অবস্থা ভাঙা নৌকার মত। কোনমতে টেনে নিচ্ছি। ইভিনিং শিফটে একটা স্কুলে কাজ করি। ঐ বেতনটাই ভরসা। কাজটা না থাকলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করতে হত।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সফিক কিছু করে না?

'করে। ও একটা ব্যাংকের ম্যানেজার। তাতে লাভ কিছু নেই। আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করুন তো — পুরো বেতন কখনো সে আমার হাতে দিয়েছে কি-না। এমনও মাস যায় একটা পয়সা আমাকে দেয় না। আপনিই বলুন, আমি কি বাচ্চাগুলোকে পানি খাইয়ে মানুষ করব?'

সফিক বলল, চুপ কর। প্রথম দিনেই কী অভিযোগ শুরু করলে! এইসব বলার সুযোগ আরো পাবে। আজ না বললেও চলবে। ফাইন করে চা বানাও। হুমায়ুন খুব চা খায়। সে আগের জন্মে চা বাগানের কুলী ছিল।

সফিকের স্ত্রী কঠিন গলায় বলল, ভাই, চা আপনাকে খাওয়াচ্ছি — কিন্তু আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে। এবং যাবার আগে আপনার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলে যেতে হবে — তার নিজের সংসারটাই আসল —। আগে সংসার দেখতে হবে . . .

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

বেড়াতে এসে এ কী পারিবারিক সমস্যার মধ্যে পড়লাম! সফিক প্রায় জোর করে তার স্ত্রীকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিল। আমি বললাম, তোর সমস্যাটা কি?

'আরেক দিন বলব।'

'আজই শুনে যাই।'

সফিক খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সমস্যা বলা শুরু করল। সফিকের জবানীতেই তার সমস্যা শুনি।

'বুঝলি দোস্ত, তখন সবে চাকরি পেয়েছি। বিয়ে-টিয়ে করিনি। নিউ পল্টন লাইনে এক কামরার একটা বাসা নিয়ে থাকি। দেশে টাকা পাঠাতে হয় না। বেতন যা

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

পাই নিজেই খরচ করি। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হৈ-চৈ। এখানে ওখানে বেড়ানো খানিকটা বদ অভ্যাসও হয়ে গেল — মাঝে-মধ্যে মদ্যপান করা। বন্ধু-বান্ধব এসে ধরে — একটা হুইস্কির বোতল কিনে আন। বেতন পেয়েছিস, সেলিব্রেট কর্। কিনে ফেলি। অভ্যাসটা স্থায়ী হল না, কারণ আমার বডি সিস্টেম এলকোহল সহ্য করে না। সামান্য খেলেও সারা রাত জেগে থাকতে হয় — এবং অবধারিতভাবে শেষ রাতে হড় হড় করে বমি হয়।

এক রাতের কথা — সামান্য মদ্যপান করে বাসায় ফিরছি। সামান্যতেই নেশা হয়ে গেছে। একটা রিকশা নিয়েছি। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে রিকশা থেকে পড়ে যাব। অনেক কষ্টে হুড ধরে বসে আছি, এমন সময় এক লোক তার ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা চাইতে এল। তার ছেলের চিকিৎসার জন্যে খরচ। আমি ছেলেটিকে দেখে চমকে উঠলাম। সাত-আট বছর বয়স। ফুটফুটে চেহারা। সম্পূর্ণ নগ্ন। নগ্ন থাকার কারণ হল — তার অসুখের ডিসপ্লে নগ্ন না হলে সম্ভব নয়। ছেলেটির অণ্ডকোষ ফুটবলের মত প্রকাণ্ড। তাকালেই ঘেন্না হয়। আমি দ্রুত একটা একশ' টাকার নোট বের করে দিলাম। ছেলের বাবা আনন্দের হাসি হাসল। এই হাসি দেখেই মনে হল — এই লোক তো ছেলের চিকিৎসা করাবে না। ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা করাই তার পেশা। ছেলে সুস্থ হলে বরং তার সমস্যা।

আমি বললাম, রোজ ভিক্ষা করে কত পাওয়া যায়?

সে গা-ছাড়া ভাব করে বলল, ঠিক নাই। কোনদিন বেশি, কোনদিন কম।

'আজ কত পেয়েছ? আমারটা বাদ দিয়ে কত?'

'আছে কিছু।'

'কিছু-টিছু না। কত পেয়েছ বল।'

লোকটি বলতে চায় না। কেটে পড়তে চায়। আমি তখন নেশাগ্রস্ত। মাথার ঠিক নেই। আমি হুংকার দিলাম, যাচ্ছ কোথায়? এক পা গেছ কি খুন করে ফেলব। বল আজ কত পেয়েছ —?

'ধরেন দুই শ'।'

'তুমি কি এই ছেলেকে চিকিৎসার জন্যে কোন দিন হাসপাতালে নিয়ে গেছ? বল ঠিক করে, মিথ্যা কথা বললে খুন করে ফেলব।'

সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। আমি বললাম, এখনি চল আমার সাথে হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজে আমার এক বন্ধু আছে, ডাক্তার — তাকে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। বাচ্চা কোলে নিয়ে রিকশায় উঠে আস।

সে কিছুতেই আমার সঙ্গে যাবে না। আমি নিয়ে যাবই। মাতালদের মাথায় একটা কিছু ঢুকে পড়লে সহজে বের হতে চায় না। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ — চিকিৎসা

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

করাবই। এর মধ্যে আমার চারদিকে লোক জমে গেছে। সবাই আমাকে সমর্থন করছে। লোকটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেছে। সে মিন মিন করে বলল, ডাক্তার অপারেশন করব। অপারেশন করলে আমার পুলা মারা যাইব।

আমি আবারো হুংকার দিলাম — ব্যাটা ফাজিল। ছেলের অসুখের চিকিৎসা করাবে না। অসুখ দিয়ে ফয়দা লুইবে — চল্ হাসপাতালে।

অসাধ্য সাধন করলাম। দুপুর রাতে এদের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বন্ধুকে খুঁজে বের করলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলল, এই দুপুর-রাতে রোগি ভর্তি করব কি ভাবে? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এই যন্ত্রণা কোত্থেকে জুটিয়েছিস?

আমি বললাম, কিচ্ছু শুনতে চাই না। তুই এর ব্যবস্থা করবি। খরচ যা লাগে আমি দিব।

ব্যবস্থা একটা হল। দেখা গেল, অসুখ তেমন জটিল নয়। খাদ্যনালীর অংশবিশেষ মূত্রথলিতে নেমে গেছে। ডাক্তার খাদ্যনালীটা উপরে তুলে দেবে। মূত্রনালী ফুটো ছোট করে দেবে। অসুখটা হল খারাপ ধরনের হার্নিয়া।

অপারেশনের তারিখ ঠিক হল। আমি মহাখুশি। শুধু ছেলের বাবা কেঁদে-কেটে অস্থির। তার ধারণা, ছেলে মারা যাচ্ছে। তার একটাই ছেলে। স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেকে নিয়ে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। একটাই তার একমাত্র শখ। মনে মনে বললাম, হারামজাদা! ছেলের অসুখ হওয়ায় মজা পেয়ে গেছিস? দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো বার করছি। শুওর কা বাচ্চা। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। ছেলেকে শুধু যে ভাল করব তাই না স্কুলেও ভর্তি করাব। মজা বুঝবি।

অপারেশন হয়ে গেল। সাকসেসফুল অপারেশন। ছেলেটিকে অপারেশন টেবিল থেকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নেয়া হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইনটেনসিভ কেয়ারে নেয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটা মারা গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হায়, হায়! এ কি সর্বনাশ! আমার কারণে ছেলেটা মারা গেল? ছেলের বাবার সঙ্গে দেখা করার সাহসও হল না। আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চলে এলাম।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম — আর পরোপকার করতে যাব না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। সারা রাত এক ফোটা ঘুম হল না। কেন ছেলেটা মরে গেল? কেন?

বুঝলি দোস্ত, ছেলেটা মারা যাবার পর আমার আসল সমস্যা শুরু হল। আমার রোখ চেপে গেল। ঠিক করলাম — যখন যেখানে অসুস্থ ছেলেপেলে দেখব, চিকিৎসা করাব। দেখি কি হয়। দেখি এরা বাঁচে না মরে। সেই থেকে শুরু।

রাস্তায় অসুখ-বিসুখে কাতর কাউকে দেখলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। টাকা-পয়সা সব এতেই চলে যায়।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

তারপর বিয়ে করলাম। সংসার হল। অভ্যাসটা গেল না। চিকিৎসার খরচ আছে। আমি বেতনও তো তেমন কিছু পাই না। সংসারে টানাটানি লেগেই থাকে। বিয়ের সময় তোর ভাবী বেশ কিছু গয়না-টয়না পেয়েছিল। সব বেচে খেয়ে ফেলেছি। এই নিয়েও সংসারে অশান্তি। হা হা হা।

'কতজন রোগি এই ভাবে সুস্থ করেছিস?'

'অনেক।'

'আর কেউ মারা যায় নি?'

'না। আর একজনও না। প্রথমজনই শুধু মারা গেল। আর কেউ না।'

'এই মুহূর্তে কারোর চিকিৎসা করছিস?'

'হ্যাঁ এখনো একজন আছে। জয়দেবপুরের এক মেয়ে। ঠোঁট কাটা। প্লাস্টিক সার্জারী করে ঠোঁট ঠিক করা হবে।'

আমি মুগ্ধ গলায় বললাম, তুই যে কত বড় কাজ করছিস সেটা কি তুই জানিস?

সফিক অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বড় কাজ করছি, না ছোট কাজ করছি তা জানি না, তবে আমার একেকটা রোগি যেদিন সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে, সেদিন যে আমার কত আনন্দ হয় তা শুধু আমিই জানি। এই আনন্দের কোন তুলনা নেই। প্রতিবারই আমি আনন্দ সামলাতে না পেরে হাউমাউ করে কাঁদি। লোকজন, ডাক্তার, নার্স সবার সামনেই কাঁদি।

বলতে বলতে সফিকের চোখে পানি এসে গেল। পানি মুছে সে স্বাভাবিক গলায় বলল, তারপর দোস্ত, তোর খবর বল। তুই কেমন আছিস?

আমি মনে মনে বললাম, শারীরিকভাবে আমি ভাল আছি। কিন্তু আমার মনটা অসুস্থ হয়ে আছে — তুই আমার মন সুস্থ করে দে। এই ক্ষমতা অল্প কিছু সৌভাগ্যবানদের থাকে। তুই তাদের একজন।

WWW.BANGLABOOK.COM

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

sohell.kazi@gmail.com

মিসির আলি ও অন্যান্য

কিশোর বয়সে সুবোধ ঘোষের একটি উপন্যাস পড়েছিলাম — 'শুন বরনারী'। উপন্যাসের মূল চরিত্র একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, হিমাদ্রী। অনেকদিন সেই ডাক্তারের ছবি আমার চোখে ভাসতো। মাঝে মাঝে রাস্তায় কাউকে দেখে চমকে উঠে ভাবতাম, আরে, ইনি তো অবিকল হিমাদ্রীর মত। কিশোর বয়সে মাথায় অনেক পাগলামি ভর করে। সেই পাগলামির কারণেই হয়ত এক সন্ধ্যাবেলায় হিমাদ্রী বাবুর কাছে এক পাতার একটা চিঠি লিখে ফেললাম। চিঠিতে অনেক সমবেদনার কথা বলা হল। চিঠি পাঠানো যায় কি করে? হিমাদ্রী বাবুর ঠিকানা আমি জানি না, সুবোধ ঘোষের ঠিকানাও জানা নেই। চিঠিটা অনেক দিন অজ্ঞ খাতায় বন্দী পড়ে রইল। এক সময় হারিয়েও গেল। একজন মুগ্ধ কিশোরের আবেগ ও ভালবাসা হিমাদ্রী কিংবা সুবোধ ঘোষ জানতে পারলেন না।

চিঠিটি কিন্তু হারায়নি। প্রকৃতি কোন কিছুই হারাতে দেয় না। যত্ন করে তুলে রাখে। কোন এক বিশেষ সময়ে বিশেষ মুহূর্তে সেই হারানো জিনিস বের করে এনে সবাইকে হকচকিত করে দেয়। আমার বেলায় এই ব্যাপারটা ঘটল। লক্ষ্মীপুর থেকে সপ্তম শ্রেণীর জনৈক বালক মিসির আলিকে একটা একপাতার চিঠি লিখল। মিসির আলির প্রতি সমবেদনায় সেই চিঠি পূর্ণ। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই চিঠির ভাষা এবং আমার চিঠির ভাষা একই রকম। যেন প্রকৃতি পঁয়ত্রিশ বছর পর আমার চিঠিই আমাকে ফেরত পাঠাল।

আমার উপন্যাসে বারবার ফিরে আসা চরিত্রগুলিকে নিয়ে একটা লেখা তৈরি করতে বলা হয়েছে। লিখতে গিয়ে তাই মিসির আলির কথাই প্রথম মনে পড়ল। তাঁকে দিয়েই শুরু করি।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

মিসির আলি

মিসির আলি মানুষটা দেখতে কেমন? আমি ঠিক জানি না। জানলে বই-এ তাঁর চেহারার বর্ণনা থাকতো। তেমন কোন বর্ণনা নেই। চশমা পরেন এটা বলা হয়েছে। চশমা তো আর চেহারার বর্ণনা হবে না। চশমা অনেকেই পরেন।

বলা হয়েছে, তীক্ষ্ণ চোখে তিনি তাকান। সেই তীক্ষ্ণ চোখও তো কারোর বোঝার উপায় নেই কারণ চোখ ঢাকা থাকে চশমার মোটা কাচের আড়ালে। মানুষটার কি মাথাভর্তি চুল? না-কি টাক-মাথা? চুলের কথা কোন উপন্যাসে বলিনি, তবে চুল আছে। চুল যে আছে তা বুঝলাম মিসির আলিকে নিয়ে প্রচারিত দু'টা টিভি নাটকে। নাটক দু'টিতে মিসির আলির চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা আবুল হায়াত। টেকো মিসির আলিকে দেখে চমকে উঠলাম। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, না না, মিসির আলির মাথায় টাক নেই। তাঁর মাথাভর্তি ঘন চুল। এখন বললে তো হবে না, বই-এ কিছু বলিনি।

মিসির আলিকে নিয়ে যখন কিছু লিখি তখন কি কোন চেহারা আমার মনে ভাসে? সচেতনভাবে কিছু ভাসে না। অবচেতন মনে নিশ্চয়ই ছবি আঁকা থাকে। সেই ছবি সাধারণ মানুষের ছবি। অন্তর্মুখী একজন মানুষ, যিনি বই পড়তে ভালবাসেন। অন্তর্মুখী মানুষরা অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন না, কিন্তু মিসির আলি পছন্দ করেন। প্রায়ই দেখা যায় — আগ্রহ নিয়ে তিনি অনেককে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেন। অন্তর্মুখী মানুষ এই কাজটি কখনো করবে না। এই মানুষটির প্রধান গুণ কি? আমার মতে, কৌতূহল এবং বিস্ময়বোধ করার অসাধারণ ক্ষমতা। কৌতূহল আমাদের সবারই আছে, কিন্তু কৌতূহল মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় পরিশ্রমটি আমরা করি না। করতে চাই না। অন্তর্মুখী মানুষ হয়েও মিসির আলি কিন্তু এই পরিশ্রমটা করেন। উদাহরণ দেয়া যাক। উদাহরণ থেকে মিসির আলির কৌতূহলের ধরন পরিষ্কার হবে। আমরা প্রায়ই ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা জাতীয় সাইনবোর্ড দেখি। খুব কি কৌতূহলী হই? মিসির আলি কিন্তু হন। যেমন,

"মুগদাপাড়া থেকে যে রাস্তাটা মান্ডার দিকে গিয়েছে তার প্রথম ডানদিকের বাঁকে বেশ কয়টা দোকান। একটা স্টেশনারী শপ, দু'টা সাইকেল টায়ারের দোকান, একটা সেলুন এবং একটি হেকিমী ঔষধের দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা — ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা। হেকিম আবদুর রব।

মিসির আলি ইদানিং এই পথে যাওয়া-আসা করেন, কারণ তিনি বাসা নিয়েছেন মান্ডায়। ঢাকায় আসতে হলে তাঁকে অতীশ দীপংকর রোড ধরতে হয়। এই পথে

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

আসা ছাড়া উপায় নেই। দোকানগুলির সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানার দিকে তাকান।

মানুষের কৌতূহল জাগ্রত করার মত তেমন কিছু দোকানে নেই। ভেতরটা অন্ধকার। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে পুরানো ভারী আলমিরা। আলমিরার পাল্লা কাঠের বলে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। দু'পাশে বইয়ের র‍্যাকের মত বেশ কিছু র‍্যাক। র‍্যাক ভর্তি কাচের এবং চিনামাটির বৈয়ম। সব দোকানেই টেবিল বা টেবিল জাতীয় কিছু থাকে। এখানে নেই। দু'টা বেতের চেয়ার পাশাপাশি বসানো। একটিতে সারাক্ষণ ভয়ংকর রোগা, লম্বা এবং অস্বাভাবিক ফর্সা একজন মানুষ বসে থাকেন। সম্ভবত তিনিই হেকিম আবদুর রব। তাঁর হাতে একটা পত্রিকা থাকে, তবে সব সময় পত্রিকা পড়েন না। বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায়, হাতে পত্রিকা আছে ঠিকই, কিন্তু ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে।

মিসির আলি এখন পর্যন্ত এই দোকানে দ্বিতীয় কোন মানুষ দেখেননি। সঙ্গত কারণেই হেকিমী, আয়ুর্বেদী জাতীয় চিকিৎসার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে আসছে। এই দোকানের সামনে এলেই মিসির আলির জানতে ইচ্ছা করে, এই লোকটির সংসার কি করে চলে? অনেক ব্যাপার আছে জানতে ইচ্ছা করলেও জানা যায় না। মিসির আলির পক্ষে সম্ভব নয় দোকানে ঢুকে হেকিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন, আপনার কাছে তো কখনো কাউকে আসতে দেখি না। আপনার সংসার কি করে চলে?

মানুষটা দিনের পর দিন খবরের কাগজ হাতে নিয়ে কি ভাবেন, তাও মিসির আলির জানতে ইচ্ছে করে। নিজে নিঃসঙ্গ বলেই বোধহয় আরেকজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। এবং প্রায়ই ভাবেন কোন একদিন দোকানটির সামনে রিকশা থেকে নেমে পড়বেন। কৌতূহল মিটিয়ে নেবেন। সেই কোন একদিন এখনো আসছে না। কেন আসছে না এই নিয়েও মিসির আলি ভেবেছেন। তাঁর ধারণা, মানুষের কৌতূহলের একটি থ্রেসহোল্ড লিমিট আছে। কৌতূহল সেই লিমিটের নিচে হলে মানুষ কখনো তা মেটাতে চেষ্টা করে না। যখন লিমিট অতিক্রম করে কেবল তখনি কৌতূহল মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড শুরু করে। রাস্তায় কোন ভিখিরী শিশুকে একা একা কাঁদতে দেখলে আমাদের কৌতূহল হয়। জানতে ইচ্ছে করে কেন সে কাঁদছে। কিন্তু সেই কৌতূহল থ্রেসহোল্ড লিমিটের নিচে বলে কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না — এই মেয়ে কাঁদছ কেন?

পৌষ মাসের এক বিকেলে মিসির আলির কৌতূহল থ্রেসহোল্ড লিমিট অতিক্রম করল। তিনি দাওয়াখানার সামনে রিকশা থেকে নামলেন। এম্নিতেই হেকিম

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

সাহেবের ঘর থাকে অন্ধকার। আজ আরো অন্ধকার লাগছে, কারণ সন্ধ্যা হয় হয় করছে, আকাশ মেঘলা। ঘরে এখনো বাতি জ্বালানো হয়নি।

খবরের কাগজ হাতে চেয়ারে বসে থাকা ভদ্রলোক চোখ তুলে মিসির আলির দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি নিস্পৃহ। সেখানে আগ্রহ বা অনাগ্রহ কোন কিছুরই ছোঁয়া নেই। দূর থেকে ভদ্রলোকের বয়স বোঝা যাচ্ছিল না। এখন বোঝা যাচ্ছে। বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে, তবে হালকা পাতলা গড়ন বলে বোঝা যাচ্ছে না। এই বয়সে মানুষের মাথার চুল কমে যায়, তবে ভদ্রলোকের বেলায় তা হয়নি। তাঁর মাথা ভর্তি ধবধবে শাদা চুল।

মিসির আলি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমি একটা সামান্য জিনিস আপনার কাছে জানতে এসেছি। আমি আপনার কাছেই থাকি, মান্ডার নয়াবাজারে।

'বসুন।'

মিসির আলি বসলেন। ভদ্রলোক খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, কি জানতে চান বলুন?

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ পরিষ্কার। মানুষের গলার শব্দেও বয়সের ছাপ পড়ে। এই ভদ্রলোকের তা পড়েনি। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে খানিকটা বিরক্ত হচ্ছেন। মিসির আলির অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

'কি জানার জন্য এসেছেন বলুন?'

'আপনার দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানা। ইউনানী তিব্বিয়া শব্দ দু'টার মানে কি?'

'এটা জানার জন্যে এসেছেন?'

'জ্বি।'

'কেন জানতে চান?'

'কৌতূহল, আর কিছু না।'

'আপনি কি করেন?'

'তেমন কিছু করি না। এক সময় অধ্যাপনা করতাম। এখন সাইকোলজির উপর একটা বই লেখার চেষ্টা করছি। আপনিই কি হেকিম আবদুর রব?'

'না। হেকিম আবদুর রব আমার দাদা। আমরা চার পুরুষের হেকিম। আমি হচ্ছি শেষ পুরুষ। আপনি শুধুমাত্র ইউনানী এবং তিব্বিয়া এই শব্দ দু'টির অর্থের জন্যে আমার কাছে এসেছেন দেখে বিস্ময় বোধ করছি। অর্থ বলছি। আপনি কি চা খাবেন? সন্ধ্যাবেলা আমি এক কাপ চা খাই।'

'চা কি দোকান থেকে আনাবেন?'

'না, আমি নিজেই বানাব। ভাল কথা, আপনার নাম জানা হয়নি।'

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

'আমার নাম মিসির আলি।'

'মিসির আলি সাহেব, আপনি কি ধূমপান করেন?'

'জ্বি করি।'

'আমার নাম আবদুল গনি। হেকিম আবদুল গনি। আপনি বসুন, আমি চা বানাচ্ছি।'

মিসির আলি বসে রইলেন। আবদুল গনি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। দোকানের পেছনে, র‍্যাকগুলির ওপাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। চায়ের সরঞ্জাম সেখানেই রাখা। মিসির আলি লক্ষ করলেন, বেশ দামী একটি ইলেকট্রিক কেতলিতে চায়ের পানি গরম হচ্ছে। চা দেওয়াও হল দামী কাপে। ভদ্রলোক সিগারেটের টিন বের করলেন। আবদুল্লাহ নামের মিশরীয় সিগারেট। ড্যাম্প যাতে না হয় তার জন্যে বাজারজাত করা হয় টিনের কৌটায়। বাংলাদেশে এই বস্তু সচরাচর চোখে পড়ে না।

আবদুল গনি সাহেব চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আমার বড় মেয়ে কায়রোতে থাকে। সে মাঝে-মধ্যে উপহার হিসেবে এটা-সেটা পাঠায়। চায়ে চিনি হয়েছে?

'জ্বি।'

'এখন আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ইউনানী শব্দটা এসেছে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর ইউনান থেকে। ইউনান হল — গ্রীস দেশ। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর ইউনান বা গ্রীস ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের লীলাভূমি। হিপোক্রেটিসের মত পণ্ডিত এবং গ্যালেনের মত চিকিৎসকের কারণে চিকিৎসা শাস্ত্রের চরম উন্নতি হয়। গ্রীস থেকে এই বিদ্যা মুসলিম চিকিৎসকদের হাতে আসে। যেহেতু ইউনান হচ্ছে এই শাস্ত্রের কেন্দ্রভূমি, কাজেই তাঁরা এর নাম দেন ইউনানী।'

'আর তিব্বিয়া? তিব্বিয়াটা কি?'

'তিব্বিয়া এসেছে 'তিব্ব' থেকে। আরবিতে 'তিব্ব' মানে চিকিৎসা সম্পর্কিত। আপনার কৌতূহল কি মিটেছে?'

'জ্বি।'

'আরো কিছু জানতে চাইলে আসবেন। এই বিষয়ে আমার কিছু পড়াশোনা আছে। আজ তাহলে উঠুন। সন্ধ্যার পর আমি দোকান বন্ধ করে দি। আমার চোখের অসুবিধা আছে। রাতে আমি ভাল দেখি না।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, রোগী আপনার কাছে কেমন আসে?

'আসে না। আসার কথাও না। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অনেক দূর এগিয়েছে। এদের হাতে আছে শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক, সালফা ড্রাগ। চিকিৎসা

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

পদ্ধতি সহজ হয়েছে, দ্রুত হয়েছে। হেকিমী বিদ্যা আগে যেখানে ছিল এখনো সেখানেই আছে।'

'আপনার কথা থেকে তো মনে হচ্ছে বর্তমান আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শুরুটা হচ্ছে ইউনানী।'

'হ্যাঁ তাই। বর্তমান কালের ডাক্তাররা হিপোক্রেটিস শপথ নেন। ইউনানী শাস্ত্রের উন্নতি হয় হিপোক্রেটিসের পৃষ্ঠপোষকতায়। মিসির আলি সাহেব, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আজ তাহলে আপনি আসুন। রাতে আমি একেবারেই চোখে দেখি না। রিকশা এসে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যায়।"

মিসির আলি ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

তাঁর কৌতূহল শুধু ইউনানী তিব্বিয়া দাওয়াখানায় নয় — তাঁর কৌতূহল পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেও। তিনি এই সব বিজ্ঞাপন গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েন। শুধু পড়েই ভুলে যান না। ভাবেন। আবারো উদাহরণ —

"পত্রিকায় ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বের হয়েছে। সব পত্রিকায় নয়, একটি মাত্র পত্রিকায়। হারানো বিজ্ঞপ্তি, বাড়ি ভাড়া, ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে নতুন ধরনের একটি বিজ্ঞাপন। শিরোনাম — পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার শব্দটির আলাদা একটি মোহ আছে। বিজ্ঞাপনটা অনেকেই পড়ল। কেউ মাথা ঘামাল না। কারণ একটা অংকের ধাঁধা দেয়া। বলা হয়েছে, কেউ এটা পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কোন ঠিকানা নেই, বক্স নম্বর দেয়া। অল্প বয়েসী কিছু উৎসাহী ছেলেপুলে ধাঁধাটি নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করল। কেউ মনে হয় সমাধান করতে পারল না। কারণ পরের সপ্তাহে আবার বিজ্ঞাপনটি বেরুল। তার পরের সপ্তাহে আবার। পরপর চার সপ্তাহে ছাপা হবার পর বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু না, অন্য একটি পত্রিকায় আবার ছাপা হল। সেই পত্রিকায় পরপর চার সপ্তাহ ছাপা হবার পর অন্য একটি পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটি এ রকম —

পুরস্কৃত করা হবে

নীচে একটি অংকের সমস্যা দেয়া হল।
এর সমাধান কেউ করতে পারলে তাঁকে
পুরস্কৃত করা হবে। সমাধান ও পূর্ণ
নাম-ঠিকানাসহ যোগাযোগ করুন।
জিপিও পোস্ট বক্স নং ৩১১

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

$$\begin{vmatrix} ২১১ & ৭৩০ \\ ১০১ & ১২ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ১১ \\ ০ \end{vmatrix} = ১১ ৫$$

$$\begin{vmatrix} ২০০০ & ৭ \\ ১৫১ & ৪০ \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} ৪৩১ \\ ? \end{vmatrix} = ১ ১৭$$

ছ'মাস ধরে বিজ্ঞাপন ঘুরে ঘুরে সব ক'টি বড় বড় পত্রিকায় ছাপা হল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। পত্র-পত্রিকায় বিচিত্র সব জিনিস ছাপা হয়। দেশে বাতিকগ্রস্তের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। বাতিকগ্রস্তরা নিজেদের বাতিক অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। এ জন্যে পয়সা খরচ করতে তাদের বাধে না। অংকের বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয়ই এ রকম অংকের বাতিকওয়ালা কেউ দিয়েছে। কিছুদিন পর আবার নতুন কোন ধাঁধা তার মাথায় আসবে। আবার পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেবে।"

মিসির আলি এক সকালে বিজ্ঞাপনটা পড়লেন। কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন, যদি অঙ্ক সমস্যার কোন সমাধান করা যায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মিসির আলি সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। কারণ তিনি অতিমানব নন। সাধারণ একজন মানুষ। সুন্দর যুক্তি দাঁড়া করাতে পারেন। সর্বপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এ জগতে কোন রহস্য নেই। কারণ প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না। তারপরেও বারবার প্রকৃতির রহস্যের কাছে তিনি পরাজিত হন। এই পরাজয়ে আনন্দ আছে। সে আনন্দ মিসির আলি পান না। পাঠক হিসেবে আমরা পাই। মিসির আলি চরিত্রটির ধারণা কোত্থেকে পেলাম, কিভাবে পেলাম সেই প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছি। নতুন করে সেই প্রসঙ্গে লিখতে ইচ্ছা করছে না বরং ভূমিকার অংশবিশেষ তুলে দি —

"তখন থাকি নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহরে। এক রাতে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মন্টানায়। গাড়ি চালাচ্ছে আমার স্ত্রী গুলতেকিন। পেছনের সীটে আমি আমার বড় মেয়েকে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। গুলতেকিন তখন নতুন ড্রাইভিং শিখেছে। হাইওয়েতে এই প্রথম বের হওয়া। কাজেই কথাবার্তা বলে তাকে বিরক্ত করছি না। চুপ করে বসে আছি এবং খানিকটা আতঙ্কিত বোধ করছি। শুধু মনে হচ্ছে,

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো! গাড়ির রেডিও অন করা। কান্ট্রি মিউজিক হচ্ছে। ইংরেজি গানের কথা মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে না। কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না এই অবস্থা। হঠাৎ গানের একটা কলি শুনে চমকে উঠলাম —

Close your eyes and try to see

বাহ্, মজার কথা তো! আমি নিশ্চিত, মিসির আলি চরিত্রের ধারণা সেই রাতেই আমি পেয়ে যাই। মিসির আলি এমন একজন মানুষ যিনি দেখার চেষ্টা করেন চোখ বন্ধ করে। চোখ খুলেই যেখানে কেউ দেখে না সেখানে চোখ বন্ধ করে পৃথিবী দেখার এক আশ্চর্য ফলবতী চেষ্টা।

মিসির আলিকে নিয়ে লিখলাম অবশ্যি তারো অনেক পরে। প্রথম লেখা উপন্যাস 'দেবী'। মিসির আলি নামের অতি সাধারণ মোড়কে একজন অসাধারণ মানুষ তৈরির চেষ্টা 'দেবী'তে প্রথম করা হয়। মিসির আলি এমন একজন মানুষ যাঁর কাছে প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলাই একমাত্র সত্য। রহস্যময়তায় অস্পষ্ট জগৎ ইনি স্বীকার করেন না। সাধারণত যুক্তিবাদী মানুষ আবেগবর্জিত হন। যুক্তি এবং আবেগ পাশাপাশি চলতে পারে না। মিসির আলির ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রমের চেষ্টা করা হল। যুক্তি ও আবেগকে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দিলাম। . . ."

মিসির আলিকে নিয়ে আর কি লিখি! সবই তো মনে হয় লেখা হয়ে গেছে। একটা কথা না বললে প্রসঙ্গ অপূর্ণ থাকবে। কথাটা হল — মিসির আলি আমার প্রিয় চরিত্রের একটি। তাঁকে নিয়ে লিখতে আমার সব সময়ই ভাল লাগে। এই নিঃসঙ্গ, হৃদয়বান, তীক্ষ্ণ ধীশক্তির মানুষটি আমাকে সব সময় অভিভূত করেন। যতক্ষণ লিখি, ততক্ষণ তাঁর সঙ্গ পাই। বড় ভাল লাগে।

হিমু

হিমুর ভাল নাম হিমালয়।

বাবা খুব আদর করে ছেলের নাম হিমালয় রাখলেন, যাতে ছেলের হৃদয় হিমালয়ের মত বড় হয়। আকাশ রাখতে পারতেন। আকাশ হিমালয়ের চেয়েও বড়, বিস্তৃত। আকাশ রাখলেন না, কারণ আকাশ স্পর্শ করা যায় না। হিমালয় স্পর্শ করা যায়।

বাবা হিমালয়কে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা করে যদি ডাক্তার, ইন্‌জিনীয়ার বানানো যায়, তাহলে মহাপুরুষ বানানো যাবে না কেন? ট্রেনিং-এ মহাপুরুষ কেন হবে না? তিনি ছেলেকে মহাপুরুষ

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

বানানোর বিশেষ ট্রেনিং দেয়া শুরু করলেন। হিমালয় কি মহাপুরুষ হল? না হয়নি। সে যা হয়েছে তা হচ্ছে — 'হিমু'।

হিমুকে নিয়ে প্রথম লিখি ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর পর, দরজার ওপাশে — সর্বশেষ গ্রন্থের নাম — 'হিমু'।

আসলে হিমু কে? খুব সচেতন পাঠক চট করে হিমুকে চিনে ফেলবেন, কারণ হিমু হল মিসির আলির উল্টো পিঠ। বিজ্ঞানের ভাষায় এন্টি-মিসির আলি।

হিমুর কাজকর্ম রহস্যময় জগৎ নিয়ে। সে চলে এন্টি-লজিকে। সে বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে ঘুরে। রাত জেগে পথে পথে হাঁটে কিন্তু সেই সবচে' বেশি অন্তর্মুখী। মিসির আলি চোখ বন্ধ করে পৃথিবী দেখেন। সে চোখ খোলা রাখে কিন্তু কিছুই দেখে না।

মিসির আলি দেখতে কেমন আমি যেমন জানি না, হিমু দেখতে কেমন তাও জানি না। কোন বই-এ হিমুর চেহারার বর্ণনা নেই। যা আছে তাও খুব সামান্য। সে বর্ণনা থেকে চরিত্রের ছবি আঁকা যায় না। আমার নিজের মনে যে ছবিটি ভাসে তা হল — হাসি-খুশি ধরনের একজন যুবকের ছবি। যে যুবকের মুখে আছে কিশোরের সারল্য। শুধু চোখ দু'টি মিসির আলির চোখের মতই তীক্ষ্ণ। তবে এই দু'টি তীক্ষ্ণ চোখে কৌতুক ঝিকমিক করে। যেন সে সবকিছুতেই মজা পায়।

হিমুকে আনতে হয়েছে একটি বিশেষ কারণে। মিসির আলির জগৎ যে একমাত্র জগৎ নয় তা দেখানোর জন্যেই হিমুর প্রয়োজন হল। লজিক খুব ভাল কথা, সেই সঙ্গে এন্টি-লজিকও যে লজিক এই তথ্যটিও মনে রাখা দরকার। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনে এসে পৃথিবী থেমে যায়নি। বস্তুজগতের মূল অনুসন্ধান করতে করতে এখন বিজ্ঞানীরা পাচ্ছেন — আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ . . . হচ্ছে কি এসব! — কোথায় যাচ্ছি আমরা? আমরা কি খুব ধীরে ধীরে লজিকের জগতের বাইরে পা বাড়াচ্ছি না? এই জগতের কথা তো মিসির আলিকে দিয়ে বলানো যাবে না। আমাদের দরকার একজন হিমু।

সম্প্রতি এক ইন্টারভ্যুতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হল — কার প্রভাব আপনার উপর বেশি — হিমুর, না মিসির আলির? আমি একটু থমকে গেলাম। দু'টি চরিত্রই আমার তৈরি। প্রশ্নকর্তার কি উচিত ছিল না জিজ্ঞেস করা — আপনার প্রভাব এই দু'টি চরিত্রের উপর কেমন পড়েছে?

পরক্ষণেই মনে হল প্রশ্নকর্তা ঠিক প্রশ্নই করেছেন — এক সময় আমি এদের সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু এরা এখন আমার পুরো নিয়ন্ত্রণে নেই। এদের ভেতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এরাই বরং এখন আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমার নিজের সত্তার ৩০% হিমু, ৩০% মিসির আলি। বাকি চল্লিশ কি আমি জানি না। জানতে চাইও না।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

মহামতি ফিহা

আমার লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে ফিহা ঘুরেফিরে আসেন। হিমু এবং মিসির আলির মত তিনি কিন্তু এক ব্যক্তি নন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কোনটাতে তিনি মহাগণিতজ্ঞ। কোনটাতে পদার্থবিদ। যিনি চতুর্মাত্রিক জগতের সন্ধান দিয়েছেন। আমি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞান আমার অতিপ্রিয় বিষয়ের একটি। মহাপুরুষদের জীবনী আমি যতটুক আগ্রহ নিয়ে পড়ি, মহান বিজ্ঞানীদের জীবনীও ঠিক ততটুক আগ্রহ নিয়েই পড়ি। সৃষ্টির রহস্য জানার জন্যে যে ব্যাকুলতা বিজ্ঞানীদের মধ্যে কাজ করে সেই ব্যাকুলতা মহাপুরুষদের ব্যাকুলতার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। আমি আমার লেখায় ঠিক এই কারণেই মহান বিজ্ঞানীদের ছবি এঁকেছি গভীর মমতায়। যেমন ফিহা। ইনি দেখতে কেমন? চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি ভেসে উঠে তা অনেকটা আইনস্টাইনের ছবির মত। তবে মাথার সব চুল ধবধবে শাদা। চোখে-মুখে একটু রাগী ভঙ্গি আছে। এই রাগী ভঙ্গিটি কেন আছে আমি ঠিক জানি না। ইনি বাস করেন শিশুদের জগতে। কেউ কখনো সেই জগৎ থেকে মহামতি ফিহাকে বের করতে পারে না। মজাটা এখানেই। মিসির আলি, হিমু এবং ফিহাদের একটা জায়গায় মিল — এরা সবাই নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন। সচেতন পাঠকরা এর থেকে কিছু বের করতে পারেন?

জরী, পরী, তিলু, বিলু, নীলু ও রানু

নারী চরিত্রে এই নামগুলি আমি বারবার ব্যবহার করেছি। এবং এখনো করছি। বার বার ব্যবহার করা হলেও এরা একই চরিত্র নয়। আলাদা চরিত্র। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এইসব দিনরাত্রির নীলু হল বড় ভাবী। আর নীল হাতীর নীলুর বয়স হল সাত।

সে যাই হোক, আমার নায়িকারা সবাই অসম্ভব 'রূপবতী'। ওরকম কেন? রূপ দেয়ার ক্ষমতা যখন আমার হাতে তখন কেন জানি কার্পণ্য করতে ইচ্ছে করে না।

আমার ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত যত লেখালেখি তার বেশির ভাগ নায়িকা পরী, তিলু, বিলু, নীলু, রানু। নামগুলি সহজ এবং ঘরোয়া। ব্যবহার করতে ভাল লাগে। খুব পরিচিত মনে হয়।

ছাব্বিশ বছর বয়সে একটি বালিকার সঙ্গে পরিচয় হবার পর নতুন একজন নায়িকা লেখায় উঠে আসে। তার নাম জরী। বলাই বাহুল্য, সেও অসম্ভব রূপবতী। এই নায়িকা আমার পরবর্তী সব লেখাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে। কারণ যে বালিকার ছায়া দিয়ে জরী নামক চরিত্রের সৃষ্টি, সেই বালিকাটি আমার

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সাতাশ বছর বয়সে তাকে আমি বিয়ে করি। তখন তার বয়স মাত্র পনেরো। এই মেয়েটি আমার লেখালেখিতে খুব কাজে আসে। না, রাত জেগে চা বানানোর কথা বলছি না। আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাই বলেই কিশোরীর বিচিত্র মনোজগৎ সম্পর্কে জানতে পারি। একজন কিশোরীর তরুণীতে রূপান্তরের সেই বিস্ময়কর প্রক্রিয়াটিও দেখা হয়। সবই উঠে আসে লেখায়।

আমার প্রথম দিকের লেখায় নায়িকাদের বয়স খুব কম — কারণ আমার স্ত্রী, তার বয়স কম। আস্তে আস্তে আমার নায়িকাদের বয়স বাড়ে, কারণ আমার স্ত্রীর বয়স বাড়ছে। ইদানিংকালের উপন্যাসে আমার নায়িকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। কারণ গুলতেকিন (আমার স্ত্রীর কথা বলছি) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। তাহলে কি এই দাঁড়াবে যে সে যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে তখন আমার নায়ক-নায়িকারা হবে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা?

নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দেই — না তা কেন হবে? আমার মেয়েরা এখন বড় হচ্ছে। আবারো খুব কাছ থেকে তাদের দেখছি। এরা হবে আমার ভবিষ্যৎ উপন্যাসের নায়িকা।

এখনো আমার কত কথা জমা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কিছুই তো বলা হয়নি, অথচ সময় কত দ্রুত চলে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়েছিলাম। সেই ছুটিও ফুরিয়ে যাচ্ছে, অথচ একটি পৃষ্ঠাও লেখা হয়নি। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। বুকের ভেতর ধক্ করে উঠে। মনে হয় —

"ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে।"

আমি প্রার্থনা করি — হে মঙ্গলময়, তুমি আমাকে শক্তি দাও। ক্ষমতা দাও যেন আমি আমার কাজ শেষ করতে পারি। তুমি আমাকে পথ দেখাও। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।

গুলতেকিন একসময় জেগে উঠে বলে, কি হয়েছে?

আমি হেসে তাকে আশ্বস্ত করি। সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আমি জেগে থাকি। আমার ঘুম আসে না।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

বর্ষীয়াপন

কয়েক বৎসর আগের কথা। ঢাকা শহরের এক কম্যুনিটি সেন্টারে বিয়ে খেতে গিয়েছি। চমৎকার ব্যবস্থা। অতিথির সংখ্যা কম। প্রচুর আয়োজন। থালা–বাসনগুলি পরিচ্ছন্ন। যারা পোলাও খাবেন না তাঁদের জন্যে সরু চালের ভাতের ব্যবস্থা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দেখলাম বেশকিছু বিদেশী মানুষও আছেন। তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে আগ্রহী। দেখাবার মত কোন অনুষ্ঠান নেই বলে কন্যা–কর্তা খানিকটা বিব্রত। এটা শুধুমাত্র খাওয়ার অনুষ্ঠান তা বলতে বোধহয় কন্যা–কর্তার খারাপ লাগছে। বিদেশীরা যতবারই জানতে চাচ্ছে, মূল অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে? ততবারই তাঁদের বলা হচ্ছে, হবে হবে।

কোণার দিকের একটা ফাঁকা টেবিলে খেতে বসেছি। আমার পাশের চেয়ারে এক বিদেশী ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমার কিছুটা মেজাজ খারাপ হল। মেজাজ খারাপ হবার প্রধান কারণ — ইনি সঙ্গে করে কাঁটা চামচ নিয়ে এসেছেন। এঁদের এই আদিখ্যেতা সহ্য করা মুশকিল। কাঁটা চামচ নিশ্চয়ই এখানে আছে। সঙ্গে করে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি আগেও লক্ষ করেছি, যারা কাঁটা চামচ দিয়ে খায় তারা হাতে যারা খায় তাদের বর্বর গণ্য করে। যেন সভ্য জাতির একমাত্র লগো হল কাঁটা চামচ। পাশের বিদেশী তাঁর পরিচয় দিলেন। নাম পল অরসন। নিবাস নিউমেক্সিকোর লেক সিটি। কোন এক এনজিও–র সঙ্গে যুক্ত আছেন। বাংলাদেশে এসেছেন অল্প দিন হল। এখনো ঢাকার বাইরে যাননি। বিমানের টিকিট পাওয়া গেলে সামনের সপ্তাহে কক্সবাজার যাবেন।

কিছু জিজ্ঞেস না করলে অভদ্রতা হয় বলেই বললাম, বাংলাদেশ কেমন লাগছে?

পল অরসন চোখ বড় বড় করে বলল, **Oh, wonderful!**

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

এদের মুখে Oh wonderful শুনে আহ্লাদিত হবার কিছু নেই। এরা এমন বলেই থাকে। এরা যখন এদেশে আসে তখন তাদের বলে দেয়া হয়, নরকের মত একটা জায়গায় যাচ্ছ। প্রচণ্ড গরম। মশা-মাছি। কলেরা-ডায়ারিয়া। মানুষগুলিও খারাপ। বেশির ভাগই চোর। যারা চোর না তারা ঘুষখোর। এরা প্রোগ্রাম করা অবস্থায় আসে, সেই প্রোগ্রাম ঠিক রেখেই বিদেয় হয়। মাঝখানে Oh wonderful জাতীয় কিছু ফাঁকা বুলি আওড়ায়।

আমি পল অরসনের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললাম, তুমি যে ওয়ান্ডারফুল বললে, শুনে খুশি হলাম। বাংলাদেশের কোন্ জিনিসটা তোমার কাছে ওয়ান্ডারফুল মনে হয়েছে?

পল বলল, তোমাদের বর্ষা।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। এ বলে কি! আমি আগ্রহ নিয়ে পলের দিকে তাকালাম। পল বলল, বৃষ্টি যে এত সুন্দর হতে পারে এদেশে আসার আগে আমি বুঝতে পারিনি। বৃষ্টি মনে হয় তোমাদের দেশের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি একবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রিকশার হুড ফেলে মতিঝিল থেকে গুলশানে গিয়েছি। আমার রিকশাওয়ালা ভেবেছে, আমি পাগল।

আমি পলের দিকে ঝুঁকে এসে বললাম, তোমার কথা শুনে খুব ভাল লাগল। অনেক বিদেশীর অনেক সুন্দর কথা আমি শুনেছি, কিন্তু তোমার মত সুন্দর কথা আমাকে এর আগে কেউ বলেনি। এত চমৎকার একটি কথা বলার জন্যে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হল।

পল অবাক হয়ে বলল, আমি কি অপরাধ করেছি?

'পকেট থেকে কাঁটা চামচ বের করে অপরাধ করেছ।'

পল হো-হো করে হেসে ফেলল। বিদেশীরা এমন প্রাণখোলা হাসি হাসে না বলেই আমার ধারণা। পল অরসনের আরো কিছু ব্যাপার আমার পছন্দ হল। যেমন, খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, নাও, সিগারেট নাও।

বিদেশীরা এখন সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে। তারা সিগারেট তৈরি করে গরিব দেশগুলিতে পাঠায়। নিজেরা খায় না। ভাবটা এরকম — অন্যরা মরুক, আমরা বেঁচে থাকব। তারপরেও কেউ কেউ খায়। তবে তারা কখনো অন্যদের সাধে না।

আমি পলের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। পানের ডালা সাজানো ছিল। পল নিতান্ত পরিচিত ভঙ্গিতে পান মুখে দিয়ে চুন খুঁজতে লাগল। এধরনের সাহেবদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। বর্ষা নিয়েই কথা বলা যেতে পারে। তাছাড়া গরম

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

পড়েছে প্রচণ্ড। এই গরমে বৃষ্টির কথা ভাবতেও ভাল লাগে। আমি বললাম, পল, তোমার বর্ষা কখন ভাল লাগল?

পল অরসন অবিকল বৃদ্ধা মহিলাদের মত পানের পিক ফেলে হাসিমুখে বলল, সে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছি দুপুরে। প্লেন থেকে নেমেই দেখি প্রচণ্ড রোদ, প্রচণ্ড গরম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম, সর্বনাশ হয়েছে! এই দেশে থাকব কি করে? বনানীতে আমার জন্যে বাসা ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেখানে এয়ারকুলার আছে বলে আমাকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে। আমি ভাবছি, কোনমতে বাসায় পৌঁছে এয়ারকুলার ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকব। ঘরে কোন চৌবাচ্চা থাকলে সেখানেও গলা ডুবিয়ে বসে থাকা যায়।

বাসায় পৌঁছে দেখি, এয়ারকুলার নষ্ট। সারাই করার জন্যে ওয়ার্কশপে দেয়া হয়েছে। মেজাজ কি যে খারাপ হল বলার না। ছটফট্ করতে লাগলাম। এক ফোঁটা বাতাস নেই। ফ্যান ছেড়ে দিয়েছি, ফ্যানের বাতাসও গরম।

বিকেলে এক মির‍্যাকল ঘটে গেল। দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘ। আমার বাবুর্চি ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, কালবোশেখি কামিং স্যার। ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। মনে হল, আনন্দজনক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝপ করে গরম কমে গেল। হিম-শীতল হাওয়া বইতে লাগল। শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর নামল বৃষ্টি। প্রচণ্ড বর্ষণ, সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বাবুর্চি ইয়াছিন ছুটে এসে বলল, স্যার, শিল পড়তাছে, শিল। বলেই ছাদের দিকে ছুটে গেল। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে। ছাদে উঠে দেখি, চারদিকে মহা আনন্দময় পরিবেশ। আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করে শিল কুঁড়াচ্ছে। আমি এবং আমার বাবুর্চি আমরা দু'জনে মিলে এক ব্যাগ শিল কুঁড়িয়ে ফেললাম। আমি ইয়াছিনকে বললাম, এখন আমরা এগুলি দিয়ে কি করব?

ইয়াছিন দাঁত বের করে বলল, ফেলে দিব।

আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। প্রথম তুষারপাতের সময় আমরা তুষারের ভেতর ছোটাছুটি করতাম। তুষারের বল বানিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে দিতাম। এখানেও তাই হচ্ছে। সবাই বৃষ্টির পানিতে ভিজে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

আমি পলকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

এসো কর স্নান নবধারা জলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে।

পল বলল, তুমি কি বললে?

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

'রবীন্দ্রনাথের গানের দু'টি লাইন বললাম। তিনি সবাইকে আহ্বান করছেন — বর্ষার প্রথম জলে স্নান করার জন্যে।'

'বল কি! তিনি সবাইকে বৃষ্টির পানিতে ভিজতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি আর কি বলেছেন?'

'আরো অনেক কিছুই বলেছেন। তাঁর কাব্যের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে বর্ষা।'

'বল কি!'

'শুধু তাঁর না, এদেশে যত কবি জন্মেছেন তাঁদের সবার কাব্যের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে বর্ষা।'

পল খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, বর্ষা নিয়ে এ পর্যন্ত লেখা সবচে' সুন্দর কবিতাটি আমাকে বল তো, প্লীজ।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম,

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

'এই এক লাইন?'

'হ্যাঁ, এক লাইন।'

'এর ইংরেজি কি?'

'এর ইংরেজি হয় না।'

'ইংরেজি হবে না কেন?'

'আক্ষরিক অনুবাদ হয়। তবে তার থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে —

Patter patter rain drops, flood in the river.'

পল বিস্মিত হয়ে বলল, আমার কাছে তো মনে হচ্ছে খুবই সাধারণ একটা লাইন।

'সাধারণ তো বটেই। তবে অন্যরকম সাধারণ। এই একটি লাইন শুনলেই আমাদের মনে তীব্র আনন্দ এবং তীব্র ব্যথাবোধ হয়। কেন হয় তা আমরা নিজেরাও ঠিক জানি না।'

পল হা করে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, বর্ষা সম্পর্কে এরকম মজার আর কিছু আছে?

আমি হাসিমুখে বললাম, বর্ষার প্রথম মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কিছু মাছের মাথা খারাপের মত হয়ে যায়। তারা পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

আসে।

'আশা করি তুমি আমার লেগ পুলিং করছ না।'

'না, লেগ পুলিং করছি না। আমাদের দেশে এরকম ফুল আছে যা শুধু বর্ষাকালেই ফুটে। অদ্ভুত ফুল। পৃথিবীর আর কোন ফুলের সঙ্গে এর মিল নেই। দেখতে সোনালি একটা টেনিস বলের মত। যতদিন বর্ষা থাকবে ততদিন এই ফুল থাকবে। বর্ষা শেষ, ফুলও শেষ।'

'ফুলের নাম কি?'

'কদম।'

আমি বললাম, এই ফুল সম্পর্কে একটা মজার ব্যাপার হল — বর্ষার প্রথম কদম ফুল যদি কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে দেয় তাহলে তাদের সম্পর্ক হয় বিষাদমাখা। কাজেই এই ফুল কেউ কাউকে দেয় না।

'এটা কি একটা মীথ?'

'হ্যাঁ, মীথ বলতে পার।'

পল তার নোটবই বের করে কদম ফুলের নাম লিখে নিল। আমি সেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের চারটি চরণও লিখে দিলাম।

তুমি যদি দেখা না দাও
করো আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।

(If thou showest me not thy face,
If thou leavest me wholly aside,
I know not how I am to pass
These long rainy hours.)

পল অরসনের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তবে ঘোর বর্ষার সময় আমি যখন রাস্তায় থাকি তখন খুব আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকাই, যদি রিকশার হুড-ফেলা অবস্থায় ভিজতে ভিজতে কোন সাহেবকে যেতে দেখা যায়।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

sohell.kazi@gmail.com

ফ্রাংকেনস্টাইন

আমি কি করে এক দানব তৈরি করলাম সেই গল্প আপনাদের বলি। অয়োময়ের পর দু'বছর কেটে গেছে। হাতে কিছু সময় আছে। ভাবলাম সময়টা কাজে লাগানো যাক। টিভির বরকতউল্লাহ সাহেব অনেক দিন থেকেই তাঁকে একটা নাটক দেবার কথা বলছেন। ভাবলাম ছয় সাত এপিসোডের একটা সিরিজ নাটক তাঁকে দিয়ে আবার শুরু করা যাক। এক সকালবেলা তাঁর সঙ্গে চা খেতে খেতে সব ঠিক করে ফেললাম। নাটক লেখা হবে ভূতপ্রেত নিয়ে। নাম ছায়াসঙ্গী। দেখলাম নাটকের বিষয়বস্তু শুনে তিনি তেমন ভরসা পাচ্ছেন না। আমি বললাম, ভাই আপনি কিছু ভাববেন না। এই নাটক দিয়ে আমরা লোকজনদের এমন ভয় পাইয়ে দেব যে তারা রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে পারবে না।

বরকতউল্লাহ সাহেব বিরস গলায় বললেন, মানুষদের ভয় দেখিয়ে লাভ কি?

অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রশ্ন। যেভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন তাতে যে কেউ ঘাবড়ে যাবে। আমি অবশ্যি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হলাম যে ভয় পাবার মধ্যেও আনন্দ আছে। কে না জানে সুকুমার কলার মূল ব্যাপারটাই হল আনন্দ। বরকতউল্লাহ সাহেব নিমরাজি হলেন। আমি পরদিনই গা ছমছমানো এক ভূতের নাটক নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত। নাটক পড়ে শুনালাম। নিজের নাটক পড়ে আমার নিজেরই গা ছমছম করতে লাগলো। বরকতউল্লাহ সাহেব বললেন, অসম্ভব! এই নাটক বানানোর মত টেকনিক্যাল সাপোর্ট আমাদের নেই। আপনি সহজ কোন নাটক দিন।

আমার মনটাই গেল খারাপ হয়ে। আমি বললাম, দেখি।

'দেখাদেখি না। আপনাকে আজই নাটকের নাম দিতে হবে। টিভি গাইডে নাম ছাপা হবে।'

আমি একটা কাগজ টেনে লিখলাম, কোথাও কেউ নেই।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

বরকত সাহেব বললেন, কোথাও কেউ নেই মানে কি? আমি তো আপনার সামনেই বসে আছি।

আমি বললাম, এটাই আমার নাটকের নাম। এই নামে আমার একটা উপন্যাস আছে। উপন্যাসটাই আমি নাটকে রূপান্তরিত করে দেব।

বরকত সাহেব আঁৎকে উঠে বললেন, না না, নতুন কিছু দিন। উপন্যাস তো অনেকের পড়া থাকবে। গল্প আগেই পত্রিকায় ছাপা হয়ে যাবে।

আমি বললাম, এটা আমার খুব প্রিয় লেখার একটি। আপনি দেখুন সুবর্ণাকে পাওয়া যায় কি না। সুবর্ণাকে যদি পাওয়া যায় তাহলে কম পরিশ্রমে সুন্দর একটা নাটক দাঁড়া হবে।

'সুবর্ণাকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে কি আপনি নতুন নাটক লিখবেন?'

'হ্যাঁ লিখব।'

সুবর্ণাকে পাওয়া গেল। আসাদুজ্জামান নূর বললেন, তিনি বাকেরের চরিত্রটি করতে চান। বাকেরের চরিত্রটি তাঁকেই দেয়া হল। 'ফ্রাংকেনস্টাইন' তৈরির দিকে আমি খানিকটা এগিয়ে গেলাম। বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইনের দানবটা তো মানুষ এক নামে চেনে। বাকের হল সেই 'ফ্রাংকেনস্টাইন'।

নাটকটির সপ্তম পর্ব প্রচারের পর থেকে আমি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। সবাই জানতে চাচ্ছে বাকেরের ফাঁসি হবে কি না। রোজ গাদা-গাদা চিঠি। টেলিফোনের পর টেলিফোন। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এই ব্যাকুলতার মানেটা কি? আমি নাটক লিখতে গিয়ে মূল বই অনুসরণ করছি। বই-এ বাকেরের ফাঁসি আছে। নাটকেও তাই হবে। যারা আমাকে চিঠি লিখেছেন তাদের সবাইকেই আমি জানালাম, হ্যাঁ ফাঁসি হবে। আমার কিছু বক্তব্য আছে। বাকেরকে ফাঁসিতে না ঝুলালে সেই বক্তব্য আমি দিতে পারব না। তাছাড়া আমাকে মূল বই অনুসরণ করতে হবে।

এক অধ্যাপিকা আমাকে জানালেন — 'শেক্সপিয়রের রোমিও জুলিয়েট বিয়োগান্তক লেখা। কিন্তু যখন রোমিও জুলিয়েট ছবি করা হল তখন নায়ক, নায়িকার মিল দেখানো হল। আপনি কেন দেখাবেন না? আপনাকে দেখাতেই হবে'।

একি যন্ত্রণা!

তবে এটা যন্ত্রণার শুধু শুরু। তবলার ঠুকঠাক। মূল বাদ্য শুরু হল নবম পর্ব প্রচারের পর। আমি দশ বছর ধরে টিভিতে নাটক লিখছি এই ব্যাপার আগে দেখিনি। পোস্টার, মিটিং, মিছিল — 'হুমায়ুনের চামড়া তুলে নেব আমরা।' রাতে ঘুমুতে পারি না, দু'টা তিনটায় টেলিফোন। কিছু টেলিফোন তো রীতিমত ভয়াবহ — 'বাকের ভাইয়ের কিছু হলে রাস্তায় লাশ পড়ে যাবে।' আপাত দৃষ্টিতে এইসব কাণ্ড,

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

কারখানা আমার খারাপ লাগার কথা নয়, বরং ভাল লাগাই স্বাভাবিক। আমার একটি নাটক নিয়ে এতসব হচ্ছে এতে অহংবোধ তৃপ্ত হওয়ারই কথা। আমার তেমন ভাল লাগল না। আমার মনে হল একটা কিছু ব্যাপার আমি ধরতে পারছি। দর্শক রূপকথা দেখতে চাচ্ছে কেন? তারা কেন তাদের মতামত আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে? আমি কি লিখব বা না লিখব সেটা তো আমি ঠিক করব। অন্য কেউ আমাকে বলে দেবে কেন?

বাকেরের মত মানুষদের কি ফাঁসি হচ্ছে না?

এ দেশে কি সাজানো মামলা হয় না?

নিরপরাধ মানুষ কি ফাঁসির দড়িতে ঝুলে না?

ঐ তো সেদিনই পত্রিকায় দেখলাম ৯০ বছর পর প্রমাণিত হল লোকটি নির্দোষ। অথচ হত্যার দায়ে ৪০ বছর আগেই তার ফাঁসি হয়ে গেছে।

সাহিত্যের একটি প্রচলিত ধারা আছে যেখানে সত্যের জয় দেখানো হয়। অত্যাচারী মোড়ল শেষ পর্যায়ে এসে মৃত্যুবরণ করেন জাগ্রত জনতার কাছে। বাস্তব কিন্তু সেরকম নয়। বাস্তবে অধিকাংশ সময়েই মোড়লরা মৃত্যুবরণ করেন না। বরং বেশ সুখে-শান্তিতেই থাকেন। ৭১-এর রাজাকাররা এখন কি খুব খারাপ আছেন? আমার তো মনে হয় না। কুত্তাওয়ালীরা মরেন না, তাদের কেউ মারতে পারে না। ক্ষমতাবান লোকদের নিয়ে তারা মচ্ছব বসায়। দূর থেকে আমাদের তারা নিয়ন্ত্রণ করে।

আমি আমার নাটকে কুত্তাওয়ালীর প্রতি ঘৃণা তৈরি করতে চেয়েছি। তৈরি করেছিও। কুত্তাওয়ালীকে মেরে ফেলে কিন্তু সেই ঘৃণা আবার কমিয়েও দিয়েছি। আমরা হাঁপ ছেড়ে ভেবেছি — যাক দুষ্ট শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু কুত্তাওয়ালী যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আমাদের ঘৃণা থেমে যেত না, প্রবহমান থাকতো। দর্শকরা এক ধরনের চাপ নিয়ে ঘুমুতে যেতেন।

আমার মূল উপন্যাসে কুত্তাওয়ালীর মৃত্যু হয়নি, নাটকে হয়েছে। কেন হয়েছে? হয়েছে, কারণ মানুষের দাবীর কাছে আমি মাথা নত করেছি। কেনই বা করব না? মানুষই তো সব, তাদের জন্যেই তো আমার লেখালেখি। তাদের তীব্র আবেগকে আমি মূল্য দেব না তা তো হয় না। তবে তাঁদের আবেগকে মূল্য দিতে গিয়ে আমার কষ্ট হয়েছে। কারণ আমি জানি, আমি যা করছি তা ভুল। আমার লক্ষ্য মানুষের বিবেকের উপর চাপ সৃষ্টি করা। সেই চাপ সৃষ্টি করতে হলে দেখাতে হবে যে কুত্তাওয়ালীর বেঁচে থাকে। মারা যায় বাকেররা।

যে কারণে নাটকে কুত্তাওয়ালীর বেঁচে থাকা প্রয়োজন ছিল ঠিক সেই কারণেই বাকেরের মৃত্যুরও প্রয়োজন ছিল। বাকেরের মৃত্যু না হলে আমি কিছুতেই দেখাতে

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

পারতাম না যে এই সমাজে কত ভয়াবহ অন্যায় হয়। আপনাদের কি মনে আছে যে একজন মানুষ (?) পনেরো বছর জেলে ছিল যার কোন বিচারই হয়নি। কোর্টে তার মামলাই ওঠেনি। ভিন দেশের কোন কথা না। আমাদের দেশেরই কথা।

ভয়াবহ অন্যায়গুলি আমরাই করি। আমাদের মত মানুষরাই করে এবং করায়। কিছু কিছু মামলায় দেখা গেছে পুলিশ অন্যায় করে, পোস্টমর্টেম যে ডাক্তার করেন তিনি অন্যায় করেন, ধুরন্ধর উকিলরা করেন। রহিমের গামছা চলে যায় করিমের কাঁধে।

পত্রিকায় দেখলাম, ১৮০ জন আইনজীবী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আমি নাকি এই নাটকে খারাপ উকিল দেখিয়ে তাঁদের মর্যাদাহানি করেছি। আমি ক্ষমা প্রার্থনা না করলে তারা আদালতের আশ্রয় নেবেন। উকিল সাহেবদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, এই নাটকে একজন অসম্ভব ভাল উকিলও ছিলেন। মুনার উকিল। যিনি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার। একশত আশিজন আইনজীবী নিজেদেরকে সেই উকিলের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে বদ উকিলের সঙ্গে করলেন। কেন?

আমাদের সমাজে কি কুত্তাওয়ালীর উকিলের মত উকিল নেই? এমন আইনজীবী কি একজনও নেই যারা দিনকে রাত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন না? মিথ্যা সাক্ষী কি আইনজীবীদেরই কেউ কেউ তৈরি করে দেন না? যদি না দেন, তা হলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেন কাঁদে?

অতি অল্পতেই দেখা যাচ্ছে সবার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আমরা কি করি না করি তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের ভাবমূর্তি বজায় থাকলেই হল। হায়রে ভাবমূর্তি!

আমি মনে হয় মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নাটকটির শেষ পর্যায়ে আমি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন করলাম। শেষ পর্বের জন্যে আমি দুঘন্টা সময় চাইলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল প্রথম এক ঘন্টায় শুধু কোর্ট দেখাব, পরের এক ঘন্টা যাবে বাকি নাটক। কোর্ট দৃশ্যের পর পনেরো দিন অপেক্ষা করা দর্শকের জন্যে কষ্টকর, নাটকের জন্যেও শুভ নয়। যে টেনশান কোর্ট দৃশ্যে তৈরি হবে, পনেরো দিনের বিরতিতে তা নিচে নেমে যাবে। টেনশান তৈরি করতে হবে আবার গোড়া থেকে। আমার বিশ্বাস ছিল টেলিভিশন আমার যুক্তি মেনে নেবে। অতীতে আমার 'অয়োময়' নাটকের শেষ পর্বের জন্য দুঘন্টা সময় দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া আমার সবসময় মনে হয়েছে, টেলিভিশনের উপর আমার খানিকটা দাবী আছে। গত দশ বছরে টিভির জন্যে কম সময় তো দেইনি। আবেদনে লাভ হল না। টিভি জানিয়ে দিল — এই নাটকের

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

জন্যে বাড়তি সময় দেয়া হবে না। দর্শকদের জন্যে টিভি, টিভির জন্যে দর্শক নয় – – এই কথাটা টিভির কর্তাব্যক্তিরা কবে বুঝবেন কে জানে। আমি ৭০ মিনিটে গল্পের শেষ অংশ বলার প্রস্তুতি নিলাম। কোর্টের দৃশ্য, কুত্তাওয়ালীর হত্যা দৃশ্য, বাকেরের ফাঁসি সব এর মধ্যেই দেখাতে হবে। শুধু দেখালেই হবে না — সুন্দর করে দেখাতে হবে। দর্শকদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে গভীর বেদনাবোধ।

সন্ধ্যাবেলা হাত-মুখ ধুয়ে লিখতে বসলাম, রাতে ভাত খেতে গেলাম না। পুরোটা এক বৈঠকে বসে শেষ করতে হবে। রাত তিনটায় লেখা শেষ হল। আমি পড়তে দিলাম আমার স্ত্রী গুলতেকিনকে। সে বলল, তোমার কোন একটা সমস্যা আছে। মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। আমি লক্ষ করেছি, তুমি অনেকখানি মমতা দিয়ে একটি চরিত্র তৈরি কর, তারপর তাকে মেরে ফেল। তুমি এই সব দিন রাত্রিতে টুনিকে মেরেছ। এবার মারলে বাকেরকে।

আমি তাকে কোন যুক্তি দিলাম না। ক্লান্ত হয়ে ঘুমুতে গেলাম। ঘুম হল না। আবার উঠে এসে বারান্দায় বসলাম। অনেকদিন পর ভোর হওয়া দেখলাম। ভোরের প্রথম আলো মনের অস্পষ্টতা কাটাতে সাহায্য করে। আমার বেলাতেও করলো। আমার মন বলল, আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বাকেরকে মরতেই হবে।

যেদিন নাটক প্রচারিত হবে তার আগের দিন রাতে দৈনিক বাংলার আমার সাংবাদিক বন্ধু হাসান হাফিজ ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন করলেন। আমাকে বললেন, আগামীকাল প্রেসক্লাবের সামনে বাকের ভাইয়ের মুক্তির দাবীতে সমাবেশ হবে। সেখান থেকে তারা আপনার এবং বরকতউল্লাহ সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করবে। পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। আপনি সরে যান।

নিজের ঘরে বসে সবাইকে নিয়ে আমার নাটক দেখার অভ্যাস। এই প্রথমবার নাটক প্রচারের দিন বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যেতে হল। খবর নিয়ে জানলাম, বাড়ির সামনের রাস্তায় কয়েকটা ককটেল ফাটানো হয়েছে। রাগী কিছু ছেলে ঘোরাফেরা করছে। পুলিশ চলে এসেছে। বাসায় ফিরলাম রাত একটায়। দরজার ফাঁক দিয়ে কারা যেন দু'টা চিঠি রেখে গেছে। একটা চিঠিতে লেখা, 'বাকেরের যেভাবে মৃত্যু হল আপনার মৃত্যুও ঠিক সেইভাবেই হবে। আমরা আপনাকে ক্ষমা করলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।' রাত দু'টার সময় ধানমন্ডি থানার একজন সাব ইন্সপেক্টর সাহেব আমাকে জানালেন, আপনি কোন ভয় পাবেন না। আমরা আছি।

প্রচন্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে রাতে ঘুমুতে গেলাম। এপাশ-ওপাশ করছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমার ছোট মেয়েটাও জেগে আছে। সেও ঘুমুতে পারছে না। তার নাকি বাকের ভাইয়ের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় এসে

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

বসলাম। মেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবা তুমি উনাকে কেন মেরে ফেললে? আমি মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, গল্পের একজন বাকের মারা গেছে যাতে সত্যিকার বাকেররা কখনো না মারা যায় ।

কথাটা হয়তো আমার ক্লাস ফোরে পড়া মেয়ের জন্যে একটু ভারী হয়ে গেল। ভারী হলেও এটাই আমার কথা। এই কথা নাটকের ভেতর দিয়ে যদি বুঝাতে না পেরে থাকি তবে তা আমার ব্যর্থতা। আমি আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করেছি। আমার চেষ্টায় কোন খাদ ছিল না। এইটুকু আমি আপনাদের বলতে চাই। বাকেরের মৃত্যুতে আপনারা যেমন ব্যথিত আমিও ব্যথিত। আমার ব্যথা আপনাদের ব্যথার চেয়েও অনেক অনেক তীব্র। বিজ্ঞানী ডঃ ফ্রাংকেনস্টাইন নিজের তৈরি দানবটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে নিজেই ধ্বংস হলেন নিজের সৃষ্টির হাতে। আমি বেঁচে আছি। কিন্তু বাকের নামের একটি চরিত্রও তৈরি করেছিলাম। আজ সে নেই। মুনা আছে, সে কোনদিনই বাকেরকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে পারবে না। মুনার এই কষ্ট আমি বুকে ধারণ করে আছি। আপনারা ভুলে যাবেন। আমি তো ভুলব না। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে মুনার কষ্ট হৃদয়ে ধারণ করে।

WWW.BANGLABOOK.COM
sohell.kazi@gmail.com

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

চাম্বিপসর রাইত

আলাউদ্দিন নামে আমার নানাজানের একজন কামলা ছিল। তাকে ডাকা হত আলাদ্দি। কামলা শ্রেণীর লোকদের পুরো নামে ডাকার চল ছিল না। পুরো নাম ভদ্রলোকদের জন্যে। এদের আবার নাম কি? একটা কিছু ডাকলেই হল। 'আলাদ্দি' যে ডাকা হচ্ছে এই-ই যথেষ্ট।

আলাউদ্দিনের গায়ের রঙ ছিল কুচকুচে কালো। এমন ঘন কৃষ্ণবর্ণ সচরাচর দেখা যায় না। মাথাভর্তি ছিল বাবরি চুল। তার চুলের যত্ন ছিল দেখার মত। জবজবে করে তেল মেখে মাথাটাকে সে চকচকে রাখতো। আমাকে সে একবার কানে কানে বলল, বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা, মানুষের পরিচয় হইল চুলে। যার চুল ঠিক তার সব ঠিক।

কামলাদের মধ্যে আলাউদ্দিন ছিল মহা ফাঁকিবাজ। কোন কাজে তাকে পাওয়া যেত না। শীতের সময় গ্রামে যখন যাত্রা বা গানের দল আসতো তখন সে অবধারিতভাবে গানের দলের সঙ্গে চলে যেত। মাসখানিক তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যেত না। অথচ শীতের মরশুম হচ্ছে আসল কাজের সময়। এমন ফাঁকিবাজকে কেউ জেনে-শুনে কামলা নেবে না। নানাজান নিতেন, কারণ তাঁর উপায় ছিল না। আলাউদ্দিন বৈশাখ মাসের শুরুতে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে চোখে সুরমা দিয়ে উপস্থিত হত। নানাজানের পা ছুঁয়ে সালাম করে তৃপ্ত গলায় বলতো, মামুজী, দাখিল হইলাম।

নানাজান চেঁচিয়ে বলতেন, যা হারামজাদা, ভাগ।

আলাউদ্দিন উদাস গলায় বলতো, ভাইগ্যা মামু কই? আল্লাপাক কি আমার যাওনের যায়গা রাখছে? রাখে নাই। তার উপরে একটা নয়ন নাই। নয়ন দুইটা ঠিক থাকলে হাঁটা দিতাম। অফমান আর সহ্য হয় না।

এর উপর কথা চলে না। তাকে আবারো এক বছরের জন্যে রাখা হত। বারবার

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

সাবধান করে দেয়া হত যেন গানের দলের সঙ্গে পালিয়ে না যায়। সে আল্লার নামে, পাক কোরানের নামে, নবীজীর নামে কসম কাটতো — আর যাবে না।

'মামুজী, আর যদি যাই তাইলে আপনের গু খাই।'

সবই কথার কথা। গানের দলের সঙ্গে তার গৃহত্যাগ ছিল নিয়তির মতো। ফেরানোর উপায় নেই। নানাজান তা ভালমতই জানতেন। বড় সংসারে অকর্মা কিছু লোক থাকেই। এদের উপদ্রব সহ্য করতেই হয়।

আলাউদ্দিনের সঙ্গে আমার পরিচয় নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। আমরা থাকতাম শহরে। বাবা ছুটি-ছাটায় আমাদের নানার বাড়ি নিয়ে যেতেন। আমরা অল্প কিছুদিন থাকতাম। এই সময়টা সে আমাদের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকতো। রাতে গল্প শোনাতো। সবই তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প। তার চেয়েও যা মজার তা হল, তার প্রতিটি গল্পের শুরু চান্নি পসর রাইতে।

'বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা, সেইটা ছেল চান্নি পসর রাইত। আহারে কি চান্নি। আসমান যেন ফাইট্যা টুকরা টুকরা হইয়া গেছে। শইলের লোম দেহা যায় এমুন চান্দের তেজ।'

সাধারণত ভূত-প্রেতের গল্পে অমাবস্যার রাত থাকে। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে অন্ধকার রাতের দরকার হয়। কিন্তু আলাউদ্দিনের ভূতগুলিও বের হয় চান্নি পসর রাতে। যখন সে বাঘের গল্প বলে, তখন দেখা যায় তার বাঘও চান্নি পসর রাতে পানি খেতে বের হয়।

ছোটবেলায় আমার ধারণা হয়েছিল, এটা তার মুদ্রাদোষ। গল্পে পরিবেশ তৈরির এই একটি কৌশলই সে জানে। দুর্বল গল্পকারের মত একই টেকনিক সে বারবার ব্যবহার করে।

একটু যখন বয়স হল তখন বুঝলাম চাঁদনি পসর রাত আলাউদ্দিনের অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয় বলেই এই প্রসঙ্গে সে বারবার ফিরে আসে। সব কিছুই সে বিচার করতে চায় চান্নি পসর রাতের আলোকে। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। নানাজানদের গ্রামের স্কুলের সাহায্যের জন্য একটা গানের আসর হল। কেন্দুয়া থেকে দু'জন বিখ্যাত বয়াতী আনা হল। হ্যাজাক লাইট-টাইট জ্বালিয়ে বিরাট ব্যাপার। গান হলও খুব সুন্দর। সবাই মুগ্ধ। শুধু আলাউদ্দিন দুঃখিত গলায় জনে জনে বলে বেড়াতে লাগলো, হ্যাজাক বাত্তি দিয়া কি আর গান হয়? এই গান হওয়া উচিত ছিল চান্নি পসর রাইতে। বিরাট বেকুবি হইছে।

সৌন্দর্য আবিষ্কার ও উপলব্ধির জন্যে উন্নত চেতনার প্রয়োজন। তাহলে কি ধরে নিতে হবে আমাদের আলাউদ্দিন উন্নত চেতনার অধিকারী ছিল? যে সৌন্দর্যের উপাসক সে সবকিছুতেই সৌন্দর্য খুঁজে পায়। আলাউদ্দিন তো তা পায়নি। তার

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

সৌন্দর্যবোধ চান্নি পসর রাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন তো হবার কথা না। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো আলাউদ্দিনের জোছনা-প্রীতির অন্য ব্যাখ্যা দেবেন। তারা বলবেন — এই লোকের অন্ধকার-ভীতি আছে। চাঁদের আলোর জন্যে তার এই আকুলতার পেছনে আছে তার আঁধার-ভীতি Dark Fobia. যে যাই বলুন, আমাকে জোছনা দেখাতে শিখিয়েছে আলাউদ্দিন। রূপ শুধু দেখলেই হয় না। তীব্র অনুভূতি নিয়ে দেখতে হয়। এই পরম সত্য আমি জানতে পারি মহামূর্খ বলে পরিচিত বোকা-সোকা একজন মানুষের কাছে। আমার মনে আছে, সে আমাকে এক জোছনা রাতে নৌকা করে বড় গাঙে নিয়ে গেল। যাবার পথে ফিসফিস করে বলল, চান্নি পসর দেখন লাগে পানির উফরে, বুঝলা ভাইগ্না ব্যাটা। পানির উফরে চান্নির খেলাই অন্য রকম।

সেবার নদীর উপর চাঁদের ছায়া দেখে তেমন অভিভূত হইনি, বরং নৌকা ডুবে যাবে কি-না এই ভয়েই অস্থির হয়েছিলাম। কারণ নৌকা ছিল ফুটো, গলগল করে পাটাতন দিয়ে পানি ঢুকছিল। ভীত গলায় আমি বললাম, পানি ঢুকছে মামা।

'আরে খও ফালাইয়া পানি, চান্নি কেমন হেইডা কও।'

'খুব সুন্দর।'

'খাইয়া ফেলতে মনে লয় না কও দেহি।'

জোছনা খেয়ে ফেলার তেমন কোন ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু তাকে খুশি করার জন্যে বললাম, হ্যাঁ। আলাউদ্দিন মহাখুশি হয়ে বলল, আও, তাইলে চান্নি পসর খাই। বলেই সে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলো খাওয়ার ভঙ্গি করতে লাগলো। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। আমি আমার একটি উপন্যাসে (অচিনপুর) এই দৃশ্য ব্যবহার করেছি। উপন্যাসের একটি চরিত্র নবু মামা জোছনা খেত।

আলাউদ্দিন যে একজন বিচিত্র মানুষ ছিল তা তার আশেপাশের কেউ ধরতে পারেনি। সে পরিচিত ছিল অকর্মা বেকুব হিসেবে। তার জোছনা-প্রীতিও অন্য কেউ লক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। তার ব্যাপারে সবাই আগ্রহী হল যখন সে এক শীতে গানের দলের সঙ্গে চলে গেল, এবং ফিরে এলো এক রূপবতী তরুণীকে নিয়ে। তরুণীর নাম দুলারী। তার রূপ চোখ-ঝলসানো রূপ।

নানাজী গম্ভীর গলায় বললেন, এই মেয়ে কে?

আলাউদ্দিন মাথা চুলকে বলল, বিবাহ করেছি মামুজী। বয়স হইছে। সংসার-ধর্ম করা লাগে। নবীজী সবেরে সংসার-ধর্ম করতে বলছেন।

'সেইটা বুঝলাম। কিন্তু এই মেয়ে কে?'

'হেইটা মামুজী এক বিরাট ইতিহাস।'

'ইতিহাসটা শুনি।'

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

ইতিহাস শুনে নানাজান গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, এরে নিয়া বিদায় হ। আমার বাড়িতে জায়গা নাই।

আলাউদ্দিন স্টেশনের কাছে ছাপড়া ঘর তুলে বাস করতে লাগল। ট্রেনের টাইমে স্টেশনে চলে আসে, কুলিগিরি করে। ছোটখাট চুরিতেও সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। থানাওয়ালারা প্রায়ই তাকে ধরে নিয়ে যায়। তার বৌ নানাজানের কাছে ছুটে আসে। নানাজান বিরক্তমুখে তাকে ছাড়িয়ে আনতে যান। নিজের মনে গজগজ করেন — এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

নানাজানকে যন্ত্রণা বেশিদিন সহ্য করতে হল না। আলাউদ্দিনের বৌ এক শীতে এসেছিল, আরেক শীতের আগেই মারা গেল। আলাউদ্দিন স্ত্রীর লাশ কবরে নামিয়ে নানাজানকে এসে কদমবুসি করে ক্ষীণ গলায় বলল, দাখিল হইলাম মামুজী।

বছর পাঁচেক পরের কথা। আমার দেশের বাইরে যাওয়া ঠিক হয়েছে। আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে নানার বাড়ি গিয়ে দেখি, আলাউদ্দিনের অবস্থা খুব খারাপ। শরীর ভেঙে পড়েছে। মাথাও সম্ভবত খানিকটা খারাপ হয়েছে। দিন-রাত উঠোনে বসে পাটের দড়ি পাকায়। দড়ির সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলে। খুবই উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক কথাবার্তা। তার একটি চোখ আগেই নষ্ট ছিল। দ্বিতীয়টিতেও ছানি পড়েছে। কিছু দেখে বলে মনে হয় না। চোখে না দেখলেও সে চান্নি পসর সম্পর্কে এখনো খুব সজাগ। এক সন্ধ্যায় হাসিমুখে আমাকে বলল, ও ভাইগ্না ব্যাটা, আইজ যে পুরা চান্নি হেই খিয়াল আছে? চান্নি দেখতে যাবা না? যত পার দেইখ্যা লও। এই জিনিস বেহেশতেও পাইবা না।

সেই আমার আলাউদ্দিনের সঙ্গে শেষ চাঁদনি দেখতে যাওয়া। সে আমাকে মাইল তিনেক হাঁটিয়ে একটা বিলের কাছে নিয়ে এল। বিলের উপর চান্নি নাকি অপূর্ব জিনিস। আমাদের চান্নি দেখা হল না। আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। মেঘ কাটল না। এক সময় টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আলাউদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চান্নি আমরার ভাগ্যে নাই। ভাগ্য খুব বড় ব্যাপার ভাইগ্না ব্যাটা। ভাগ্যে না থাকলে হয় না।

আমরা ভিজতে ভিজতে ফিরছি। আলাউদ্দিন নিচু স্বরে কথা বলে যাচ্ছে, ভাগ্যবান মানুষ এই জীবনে একজন দেখছি। তোমার মামীর কথা বলতেছি। নাম ছিল দুলারী। তার মরণ হইল চান্নি পসর রাইতে। কি চান্নি যে নামল ভাইগ্না! না দেখলে বিশ্বাস করবা না। শইল্যের সব লোম দেহা যায় এমন পসর। চান্নি পসরে মরণ তো সহজে হয় না। বেশির ভাগ মানুষ মরে দিনে। বাকিগুলো মরে অমাবস্যায়। তোমার মামীর মত দুই-একজন ভাগ্যবতী মরে চান্নি পসরে। জানি না আল্লাপাক আমার কপালে কি রাখছে। চান্নি পসরে মরণের বড় ইচ্ছা।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর খবর আমি পাই আমেরিকায়। তার মরণ চাঁদনি পসরে হয়েছিল কি-না তা চিঠিতে লেখা ছিল না, থাকার কথাও নয়। কার কি যায় আসে তার মৃত্যুতে? সেই রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আমার স্ত্রীকে বললাম, গুলতেকিন, চল যাই জোছনা দেখে আসি। সে বিস্মিত হয়ে বলল, এই প্রচণ্ড শীতে জোছনা দেখবে মানে? তাছাড়া জোছনা আছে কি-না তাই-বা কে জানে।

আমি বললাম, থাকলে দেখব, না থাকলে চলে আসব।

গাড়ি নিয়ে বের হলাম। পেছনের সীটে বড় মেয়ে নোভাকে শুইয়ে দিয়েছি। সে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। মেয়ের মা বসেছে আমার পাশে। গাড়ি চলছে উল্কার বেগে। গুলতেকিন বলল, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, মন্টানার দিকে। মন্টানার জঙ্গলে জোছনা দেখব। সে যে কি সুন্দর দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।

গাড়ির ক্যাসেট চালু করে দিয়েছি। গান হচ্ছে — আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। আমার কেন জানি মনে হল আলাউদ্দিন আমার কাছেই আছে। গাড়ির পেছনের সীটে আমার বড় মেয়ের পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে সে আমার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছে।

WWW.BANGLABOOK.COM

sohell.kazi@gmail.com

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

লালচুল

ভদ্রলোকের বয়স সত্তুরের মত।

মাথার চুল টকটকে লাল। মাথার লালচুলের জন্যেই হয়ত তাঁকে রাগী-রাগী দেখাচ্ছে। তাছাড়া কোমরের মাংসপেশীতে টান পড়ায় তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভঙ্গিটা অনেকটা সাপের ফণা তোলার মত। যেন এক্ষুনি ছোঁবল দেবেন। আমি বললাম, স্লামালিকুম।

তিনি বললেন, হুঁ।

সালামের উত্তরে সালাম দেয়াটাই প্রচলিত বিধি। তিনি হুঁ বলে এড়িয়ে গেলেন। তবে আপ্যায়ন বা শিষ্টতার কোন অভাব হল না। আমাকে হাত ধরে বসালেন। কাজের ছেলেকে চা দিতে বললেন।

আমার কাছে মনে হল ভদ্রলোক অসুস্থ। তাঁর মাথার চুল যেমন লাল চোখ দু'টিও লাল। খুব ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছেন। আমি এত দ্রুত কাউকে চোখের পাতা ফেলতে দেখিনি। বয়স বাড়লে মানুষ ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে কি-না তাও লক্ষ করিনি। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভদ্রলোক বললেন, আমার চোখে সমস্যা আছে। চোখে অশ্রুগ্রন্থি বলে কিছু ব্যাপার আছে। সেখান থেকে জলীয় পদার্থ বের হয়ে সব সময় চোখ ভিজিয়ে রাখে। আমার ঐসব গ্রন্থি নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি বললাম, আপনার চুল এমন লাল কেন?

উনি বললেন, রঙ দিয়ে লাল করেছি। মেন্দী পাতা এবং কাঁচা হলুদের সঙ্গে সামান্য থানকুনি পাতা বেটে মিশিয়ে একটা পেস্টের মত তৈরি করে চুলে মাখলেই চুল এমন লাল হয়। আপনি যখন আমার মত বুড়ো হবেন, মাথার চুল সব পেকে যাবে, তখন মাথায় রঙ ব্যবহার করতে পারেন। মাথায় রঙ ব্যবহার করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ নয়। নবী-এ-করিমের হাদিস আছে। তিনি 'খেজাব' ব্যবহার করার পক্ষে মত দিয়েছেন। 'খেজাব' হচ্ছে এক ধরনের রঙ যা চুলে লাগানো হয়।

'ও আচ্ছা।'

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

'মাথাভর্তি সাদা চুল আমার পছন্দ না। সাদা চুল হল ওাইটএ লৈঅগ, যা মনে করিয়ে দেয় খেলা শেষ হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে নাও। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা শেষ প্রহর।'

'আপনি তৈরি হতে চাচ্ছেন না!'

'তৈরি তো হয়েই আছি। শাদা ফ্ল্যাগ উড়িয়ে সবাইকে জানাতে চাচ্ছি না।'

ভদ্রলোকের বাড়ি প্রকাণ্ড। বেশির ভাগ প্রকাণ্ড বাড়ির মত এ বাড়িটিও খালি। তাঁর দুই মেয়ে। দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তারা স্বামীর সঙ্গে বাইরে থাকে। পত্নী বিয়োগ হয়েছে চার বছর আগে। এগারো কামরার বিশাল বাড়িতে ভদ্রলোক কিছু কাজের লোকজন নিয়ে থাকেন। পুরোপুরি নিঃসঙ্গ মানুষরা নানান ধরনের জটিলতায় ভুগেন। বিচিত্র সব কাজ কর্মে তাঁরা থাকতে চেষ্টা করেন। সঙ্গী হিসেবে এরা কখনোই খুব ভাল হয় না। কারণ তারাই সঙ্গী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করতে চায় না।

এই ভদ্রলোকও দেখলাম তার ব্যতিক্রম নন। তিনি দেখলাম, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারছেন না। জায়গা বদল করছেন। এবং কিছুক্ষণ পরপর ঘরের ছাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। ভাবটা এ রকম যেন ঘরের ছাদটা কিছুক্ষণের মধ্যে ভেঙে তাঁর মাথায় পড়ে যাবে।

আমি যে কাজের জন্যে এসেছিলাম সেই কাজ সারলাম। ভদ্রলোকের ছোট মেয়ের স্বামীর ঠিকানা দরকার ছিল। তিনি ঠিকানা দিতে পারছেন না, তবে টেলিফোন নাম্বার দিলেন। আমি চা খেয়ে উঠতে যাচ্ছি, তিনি বললেন, আহা, বসুন না। বসুন। অল্পক্ষণ বসুন। গল্প করুন।

নিঃসঙ্গ একজন বৃদ্ধের অনুরোধ এড়ানো মুশকিল। আমি বসলাম, কিন্তু কি বলব ভেবে পেলাম না। এই বয়সের মানুষ কি ধরনের গল্প পছন্দ করে? পরকালের গল্প? ধর্ম? আমি জানি, একটা বিশেষ বয়সের পর মানুষজন ঘোর আস্তিক হয়ে যায়। কঠিনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করে। ধর্মের কথা শুনতে ভালবাসে। মৃত্যুতেই সব শেষ না — মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই তাদের জন্যে মৃত্যু নামক অমোঘ বিধান মেনে নিতে সাহায্য করে।

আমি বললাম, আপনি বলুন আমি শুনি। পরকাল সম্বন্ধে বলুন। মৃত্যুর পর কি হবে?

তিনি চোখ পিটপিট করে বললেন, মৃত্যুর পর কি হবে মানে? কিছুই হবে না। শরীর পচে-গলে যাবে। শরীরের যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস আছে — ইলেক্ট্রন, প্রোটিন, নিউট্রন এরা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস-এর ক্ষয় নেই। কাজেই এদেরও ক্ষয় হবে না।

'আপনি কি ধর্ম-টর্ম বিশ্বাস করেন না?'

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

তিনি উত্তরে এমন সব কথা বলতে লাগলেন যা শুনলে ঘোর নাস্তিকরাও নড়ে-চড়ে বসবে এবং বলবে — বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল না। সালমান রুশদী তার কাছে কিছু না। একটু আগে যিনি নবীজীর খেজাব ব্যবহারের হাদিস দিলেন সেই তিনিই তাঁর সম্পর্কে এমন সব উক্তি করতে লাগলেন যা শুনলে নিরীহ টাইপের মুসলমানরাও চাকু হাতে তাঁর পায়ের রগ খুঁজতে বের হয়ে যাবে। এই আলোচনা আমার তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। আরবের মরুভূমির একজন নিরক্ষর ধর্মপ্রচারক হয়েও যিনি সেই সময়কার ভয়াবহ আইয়ামে জাহেলিয়াত লোকজনদের মন মানসিকতাই শুধু পরিবর্তন করেননি — সারা পৃথিবীতে এই ধর্মের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে তুচ্ছ করা ঠিক না। সমাজে অবিশ্বাসী তো থাকতেই পারে। অবিশ্বাসীদের যে কুৎসা ছড়াতে হবে তা তো না। আমি লক্ষ করেছি, অবিশ্বাসীরা কুৎসা ছড়ানো তাঁদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। বছর দু'-এক আগে যীশু খ্রিস্ট সম্পর্কে জনৈক আমেরিকান স্কলার (?)-এর একটি লেখা পড়েছিলাম, যাতে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, যীশু খ্রিস্ট ছিলেন একজন হমোসেক্সুয়েল।

আমি লালচুল এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে যেতে পারতাম। ইচ্ছা করল না। তার চেয়েও বড় কথা, ধর্ম সম্পর্কে আমার পড়াশোনাও তেমন নেই। ভদ্রলোকের দেখলাম পড়াশোনা ব্যাপক। কোরান শরীফ থেকে মূল আরবী এবং সেখান থেকে সরাসরি ইংরেজী অনুবাদ যেভাবে স্মৃতি থেকে বের করতে লাগলেন তা আমার মত মানুষকে ভড়কে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমার উঠা দরকার। উসখুস করছি। ভদ্রলোক যে উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছেন তাতে তাঁকে থামাতেও মন সায় দিচ্ছে না। তিনি এর মধ্যে চায়ের কথা বলেছেন। আমি তাতেও আগ্রহ বোধ করছি না। এ বাড়িতে কাজের মানুষ চা বানানো এখনো শিখেনি। আগের চা-টা দু' চুমুক দিয়ে রেখে দিয়েছি। নতুন চা এরচে' ভাল হবে এই আশা করা বৃথা। এমন সময় এক কাণ্ড হল, লালচুল ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু বসুন। মাগরেবের নামাজের সময় হয়েছে। নামাজটা শেষ করে আসি। মাগরেবের নামাজের জন্যে নির্ধারিত সময় আবার অল্প। আমি মনে মনে বললাম — "হলি কাউ।"

ভদ্রলোক নামাজ পড়ার জন্যে সময় বেশি নিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, স্যরি, আপনাকে বসিয়ে রাখলাম। তাহলে আবার ডিসকাশন শুরু করা যাক — তিনি আবারো কথা বলা শুরু করলেন। কথার মূল বিষয় হচ্ছে — ধর্ম মানুষের তৈরি, আল্লাহ্ মানুষ তৈরি করেননি। মানুষই আল্লাহ্ তৈরি করেছে।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

আমি বললাম, আপনি ঘোর নাস্তিক। কিন্তু একটু আগে নামাজ পড়তে দেখলাম। নামাজ পড়েন!

'হ্যাঁ পড়ি। গত পঁচিশ বছর যাবত পড়ছি। খুব কমই নামাজ ক্বাজা হয়েছে।'

'রোজাও রাখেন?'

'অবশ্যই।'

'পঁচিশ বছর ধরে রাখছেন?'

'হবে, তবে দু'বার রাখতে পারিনি। একবার গল ব্ল্যাডারের জন্যে অপারেশন হল তখন, আরেক বার — হার্নিয়া অপারেশনের সময়। দু'টাই পড়ে গেল রমজান মাসে।'

'ঘোর নাস্তিক একজন মানুষ নামাজ-রোজা পড়ছেন এটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন কি ভাবে? আপনি তো মন থেকে কিছু বিশ্বাস করছেন না। অভ্যাসের মত করে যাচ্ছেন। তাই না-কি!'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। আমি বললাম, না-কি আপনার মনে সামান্যতম হলেও সংশয় আছে?

'না, আমার মনে কোন সংশয় নেই। আমার নামাজ-রোজার পেছনে একটি গল্প আছে। শুনতে চাইলে বলতে পারি।'

'বলুন।'

'আমি জজীয়তি করতাম। তখন আমি বরিশালের সেসান ও দায়রা জজ। আমি কঠিন প্রকৃতির মানুষ। খানিকটা বোধহয় নির্দয়। অপরাধ প্রমাণিত হলে কম শাস্তি দেবার মানসিকতা আমার ছিল না। অপরাধ করেছে, শাস্তি ভোগ করবে। এই আমার নীতি। দয়া যদি কেউ দেখাতে চায় তাহলে আল্লাহ্ বলে যদি কেউ থাকে সে দেখাবে। আল্লাহ্ দয়ালু। আমি দয়ালু না।

এই সময় আমার কোর্টে একটি মামলা এল। খুনের মামলা। সাত বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে খুন হয়েছে। পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গেছে, তারপর সে আর তার স্বামী মিলে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। জমিজমা নিয়ে শত্রুতার জের। সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই আছে। আমার মনটা খারাপ হল। শত্রুতা থাকতে পারে। তার জন্যে বাচ্চা একটা মেয়ে কেন প্রাণ হারাবে? মেয়েটার বাবা সাক্ষ্য দিতে এসে কাঁদতে কাঁদতে কাঠগড়াতেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

মামলা বেশিদিন চলল না। আমি মামলার রায় দেবার দিন ঠিক করলাম। যেদিন রায় হবে তার আগের রাতে রায় লিখলাম। সময় লাগল। হত্যা মামলার রায় খুব সাবধানে লিখতে হয়। এমনভাবে লিখতে হয় যেন আপিল হলে রায় না পাল্টায়। আমি মৃত্যুদণ্ড দেব, আপিলে তা খারিজ হয়ে যাবে, তা হয় না।

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

আমি স্বামীটিকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। তার স্ত্রীকেও মৃত্যুদণ্ড দেবার ইচ্ছা ছিল। এই মহিলাই বাচ্চা মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এসেছে। প্রধান অপরাধী সে। আইনের হাত সবার জন্যেই সমান হলেও মেয়েদের ব্যাপারে কিছু নমনীয় থাকে। আমি মহিলাকে দিলাম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

রায় লেখা শেষ হল রাত তিনটার দিকে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিজেই লেবুর সরবত বানিয়ে খেলাম। খুব ক্লান্ত ছিলাম। বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুম। এমন গাঢ় নিদ্রা আমার এর আগে কখনো হয়নি।

আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের অংশটি মন দিয়ে শুনুন। স্বপ্নে দেখলাম, ৭/৮ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। কোঁকড়ানো চুল। মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার নাম-টাম কিছুই বলল না। কিন্তু মেয়েটিকে দেখেই বুঝলাম — এ হল সেই মেয়ে যার হত্যার জন্যে আমি রায় লিখেছি। একজনের ফাঁসি এবং অন্যজনের যাবজ্জীবন। আমি বললাম, কি খুকী, ভাল আছ?

মেয়েটি বলল, হুঁ।

'কিছু বলবে খুকী?'

'হুঁ।'

'বল।'

মেয়েটি খুব স্পষ্ট করে বলল, আপনি ভুল বিচার করেছেন। এরা আমাকে মারে নি। মেরেছে আমার বাবা। বাবা দা দিয়ে কুপিয়ে আমাকে মেরে দা'টা ওদের খড়ের গাদায় লুকিয়ে রেখেছে। যাতে ওদেরকে মামলায় জড়ানো যায়। ওদের শাস্তি দেয়া যায়। আমাকে মেরে বাবা ওদের শাস্তি দিতে চায়।

'তুমি এসব কি বলছ? অন্যকে শাস্তি দেয়ার জন্য কেউ নিজের মেয়েকে মারবে?'

মেয়েটি জবাব দিল না। সে তার ফ্রকের কোণা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখলাম ভোর প্রায় হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের আজান হল। আমি রান্নাঘরে ঢুকে নিজেই এক কাপ চা বানিয়ে খেলাম। স্বপ্নের ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। স্বপ্ন গুরুত্ব দেয়ার মত কোন বিষয় না। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এইসবই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। আমি মামলাটা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। স্বপ্ন হচ্ছে সেই চিন্তারই ফসল। আর কিছু না।

স্বপ্নের উপর নির্ভর করে বিচার চলে না।

রায় নিয়ে কোর্টে গেলাম। কোর্ট ভর্তি মানুষ। সবাই এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায় শুনতে চায়।

রায় প্রায় পড়তেই যাচ্ছিলাম হঠাৎ কি মনে হল — বলে বসলাম, এই মামলার

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী

WWW.BANGLABOOK.COM

তদন্তে আমি সন্তুষ্ট নই। আবার তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছি। কোর্টে বিরাট হৈচৈ হল। আমি কোর্ট এডজর্নড করে বাসায় চলে এলাম। আমার কিছু বদনামও হল। কেউ কেউ বলতে লাগল, আমি টাকা খেয়েছি। আমি নিজে আমার দুর্বলতার জন্যে মানসিকভাবে খানিকটা বিপর্যস্তও হলাম। আমার মত মানুষ স্বপ্নের মত অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপার দ্বারা পরিচালিত হবে, তা হতে পারে না। আমার উচিত জজীয়তি ছেড়ে দিয়ে আলুর ব্যবসা করা।

যাই হোক, সেই মামলার পুনঃ তদন্ত হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটির বাবা নিজেই হত্যাপরাধ স্বীকার করল। এবং আদালতের কাছে শাস্তি প্রার্থনা করল। আমি তার ফাঁসির হুকুম দিলাম। বরিশাল সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি কার্যকর হল। ঘটনার পর আমার মধ্যে সংশয় ঢুকে গেল। তাহলে কি পরকাল বলে কিছু আছে? মৃত্যুর পর আরেকটি জগৎ আছে? ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা শুরু করলাম। নামাজ-রোযা আরম্ভ হল। আশা ছিল, এতে আমার সংশয় দূর হবে। যতই পড়ি ততই আমার সংশয় বাড়ে। ততই মনে হয় God is created by man. তারপর নামাজ পড়ি এবং প্রার্থনা করি — বলি, হে মহাশক্তি, তুমি আমার সংশয় দূর কর। কিন্তু এই সংশয় দূর হবার নয়।

'নয় কেন?'

কারণ আমাদের পবিত্র গ্রন্থেই আছে — সূরা বাকারার সপ্তম অধ্যায়ে বলা আছে —

"Allah hath set a seal
On their hearts and on their hearing
And on their eyes is a veil."

"আল্লাহ্ তাদের হৃদয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে ঢেকে দিয়েছেন,
এবং টেনে দিয়েছেন চোখের উপর পর্দা।"

আমি তাদেরই একজন। আমার মুক্তি নেই।

ভদ্রলোক চুপ করলেন। আমি বিদায় নেবার জন্যে উঠলাম। তিনি আমাকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি আসছেন কেন? আপনি আসবেন না। তিনি মুখ কুঁচকে বললেন, আমাদের নবীজীর একটা হাদিস আছে। নবীজী বলেছেন — কোন অতিথি এলে তাঁকে বিদায়ের সময় বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিও।

এই বলেই তিনি বিড়বিড় করে নবী সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর কিছু কথা বলে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সম্ভবত এশার নামাজের সময় হয়ে গেছে।

---

sohell.kazi@gmail.com

ইন্টারনেট সংস্করনঃ বাংলা বুক ডট কম, নির্মানঃ সোহেল কাজী